

পার্টনার ফিল্ড স্কুল (পিএফএস)- ভূট্টা

প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল



প্রোগ্রাম অন এগ্রিকালচারাল অ্যান্ড রুরাল ট্রান্সফরমেশন ফর নিউট্রিশন, এন্টারপ্রেনরশীপ অ্যান্ড রেসিলিয়েন্স
ইন বাংলাদেশ (পার্টনার), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষি মন্ত্রণালয়

এপ্রিল ২০২৪

পিএফএস-ভূট্টা প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল

প্রোগ্রাম অন এগ্রিকালচারাল অ্যান্ড রুরাল
ট্রান্সফরমেশন ফর নিউট্রিশন,
এন্টাপ্রেনরশীপ অ্যান্ড রেসিলিয়েন্স ইন
বাংলাদেশ (পার্টনার),
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর,
কৃষি মন্ত্রণালয়

রচনা ও সংকলন

আবু কাউসার মোহাম্মদ সারোয়ার
এসএমও, পার্টনার, চট্টগ্রাম অঞ্চল
মুহাম্মদ রিয়াজউদ্দিন
এসএমও, পার্টনার, রাজশাহী অঞ্চল
অশোক কুমার রায়
এসএমও, পার্টনার, রংপুর অঞ্চল
শেখ সাজ্জাদ হোসেন,
এসএমও, পার্টনার, যশোর অঞ্চল
মাসুদ আহমেদ
এসএমও, পার্টনার, বগুড়া অঞ্চল

সম্পাদনা

মৃত্যুঞ্জয় রায়
ইএস স্পেশালিস্ট, পিসিইউ-পার্টনার

কারিগরি সহযোগিতা

ড. গৌর গোবিন্দ দাশ
এডিশনাল প্রোগ্রাম ডিরেক্টর,
এপিসিইউ-ডিএই, পার্টনার

পরামর্শক

মোহাম্মদ মিজানুর রহমান
প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর
পার্টনার, পিসিইউ-ডিএই

প্রকাশকাল

এপ্রিল ২০২৪

মুদ্রণ

মোনার্ক সলিউশন
২৫/৫ শান্তিবাগ, ঢাকা ১২১৭

পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত ও প্রচার

পার্টনার, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

এই প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল শুধুমাত্র অ-
বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে উৎস উল্লেখসহ
পুনরুৎপাদন ও ব্যবহার করা যাবে

This document can be copied
or reproduced for non-
commercial use only provided
that mention is made of the
source

সূচিপত্র

দিন	সেশন	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	১	পার্টনার ও ভূট্টার পার্টনার মাঠ স্কুল সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা এবং নিয়ম কানুন	
	২	প্রাক মূল্যায়ন (বিবিটি)	
	৩	দল গঠন	
২	৪	ফার্মার্স সার্ভিস সেন্টারের কার্যনির্বাহী কমিটির পরিচিতিরূপ ও দায়িত্ব	
	৫	ভূট্টার সম্প্রতি উদ্ভাবিত নতুন জাত ব্যবহারের গুরুত্ব, নতুন উদ্ভাবিত জাতসমূহ ও জাত নির্বাচন	
	৬	পরিবেশসম্মতভাবে, লাভজনক ও নিরাপদ ভূট্টা উৎপাদনের মূল কৌশল	
৩	৭	কৃষকদের নিয়ে অংশগ্রহণমূলক শিখন প্লটের রূপায়ন (আইসিএম) ও জাত পরীক্ষা শিখন প্লট স্থাপন নিশ্চিতকরণ	
	৮	অংকুরোদগম পরীক্ষা স্থাপন ও পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি (আলোচনা ও ব্যবহারিক)	
৪	৯	ভূট্টার বীজ বপন	
	১০	জৈব সারের পরিচিতি, ভূট্টা উৎপাদনে তার গুরুত্ব, উৎপাদন ও ব্যবহারের কৌশল	
	১১	ভূট্টা ফসলে সার ব্যবস্থাপনা	
৫	১২	ক্ষতিকর পোকামাকড়ের পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনার সাধারণ কৌশলসমূহ। কৃষকদের ভূট্টা খেতের বর্তমান পোকার সমন্বিত ব্যবস্থাপনা	
	১৩	ভূট্টা খেতের আগাছা পরিচিতি ও তার সমন্বিত দমন	
	১৪	ভূট্টার উপকারী ও অপকারী পোকামাকড় সংগ্রহ, বাছাই ও সনাক্তকরণ (ব্যবহারিক)	
৬	১৫	ভূট্টার রোগের লক্ষণ বা নমুনা সংগ্রহ, বাছাই ও সনাক্তকরণ (ব্যবহারিক)	
	১৬	কৃষকদের ভূট্টা খেতের বর্তমান রোগ ব্যবস্থাপনা	
	১৭	ভূট্টা খেতের কৃষি পরিবেশ বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া অনুশীলন	
৭	১৮	ভূট্টা খেতে উপকারী জীব সম্পর্কে ধারণা প্রদান এবং সেগুলোর বংশবৃদ্ধি ও লালনপালন করা	
	১৯	নিরাপদ খাদ্য ও পুষ্টি	
	২০	ভূট্টার পোকা/ রোগের লক্ষণ বা নমুনা সংগ্রহ, বাছাই ও সনাক্তকরণ	
৮	২১	মাসিক সভা, সঞ্চয়, ব্যাংক হিসাব খোলা ও পরিচালনা ও অন্যান্য সাংগঠনিক কাজ	
	২২	ফার্মারস সার্ভিস সেন্টার কি? এ থেকে কিভাবে কৃষকরা সহায়তা পেতে পারে ও পিএফএস কৃষকদের আয়বর্ধনমূলক কাজ কি কি হতে পারে	
	২৩	কৃষকদের ভূট্টা খেতের বর্তমান পোকা/ রোগ ব্যবস্থাপনা	
৯	২৪	জৈব বালাইনাশক পরিচিতি, তৈরি ও ব্যবহার কৌশল	
	২৫	ভূট্টা কাটা, মাড়াই, বাড়াই ও সংগ্রহের অন্যান্য ব্যবস্থাপনা	
১০	২৬	বীজ মজুদ, উদ্যোক্তা ও বিপণন এবং পরবর্তী মৌসুমে ভূট্টা চাষের পরিকল্পনা তৈরি (জাত নির্বাচনসহ)	
	২৭	ফার্মার্স সার্ভিস সেন্টারের কার্যক্রম, সেবা দান প্রক্রিয়া ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তৈরি	
	২৮	পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষায় করণীয়	

পার্টনার ও ভূট্টার পার্টনার মাঠ স্কুল সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা এবং নিয়ম কানুন

সহায়তাকারীর জন্য সেশন পরিচালনার নির্দেশনা

সহায়তাকারী সকল অংশগ্রহণকারী কৃষক-কিষাণীদের উপস্থিতি সময়মতো নিশ্চিত করে সকলকে অর্ধ-চন্দ্রাকারে বা 'ইউ' আকারে বসাবেন ও পরস্পর পরিচিত হবেন। তিনি কোথা থেকে এসেছেন, কেন এসেছেন, পিএফএস কি, কেন, কিভাবে করা হবে, সহায়তাকারী কারা, সহায়তাকারীরা কৃষকদের কিভাবে সহায়তা দেবেন, উপজেলা কৃষি অফিসের ভূমিকা কি হবে, এ পিএফএস-এর নিয়ম-কানুন কী, প্রকল্প থেকে কৃষকরা কি কি পরামর্শ সেবা, সহায়তা বা উপকরণ পাবেন, এ স্কুলের মাধ্যমে কৃষকদের কী লাভ হবে ইত্যাদি বিষয়ে এই সেশনে আলোচনা করবেন। আলোচনা হবে পারস্পারিক অংশগ্রহণমূলক।

সেশন সহায়িকা

এই সেশনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সহায়তাকারী বলবেন-

- আপনারা আজ এ সেশনে পার্টনার সম্পর্কে জানতে পারবেন ও
- যে পার্টনার ফিল্ড স্কুলে আপনারা প্রশিক্ষণের জন্য এসেছেন সে স্কুল ও স্কুলের নিয়ম কানুন সম্পর্কে জানতে পারবেন।

পার্টনার সম্পর্কে সাধারণ ধারণা

প্রকল্পের নাম: প্রোগ্রাম অন এগ্রিকালচারাল এন্ড রুরাল ট্রান্সফরমেশন ফর নিউট্রিশন, এন্টারপ্রেনরশিপ অ্যান্ড রেসিলিয়েন্স ইন বাংলাদেশ (পার্টনার)

উদ্যোগী মন্ত্রণালয়: কৃষি মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: (১) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) - লিড এজেন্সী, (২) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি), (৩) কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম), (৪) বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি), (৫) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি), (৬) বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), (৭) বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ)।

স্ট্রাটাজিক পার্টনার: বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা), বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারটান), বাংলাদেশ গম ও ভূট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিডব্লিউএমআরআই), মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট (এসআরডিআই), তুলা উন্নয়ন বোর্ড (সিডিবি), বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই), বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই) ও হর্টিকালচার ফাউন্ডেশন।

বাস্তবায়ন মেয়াদ: জুলাই ২০২৩ থেকে জুন ২০২৮

প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়): মোট ৬৯১০৯৩.১২

অর্থায়নে: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বিশ্বব্যাংক ও ইফাদ

প্রকল্পের আর্থিক পদ্ধতি: প্রোগ্রাম ফর রেজাল্টস ফাইন্যান্সিং (পি ফর আর)

কর্মএলাকা: পার্টনার প্রকল্পটি ৮ বিভাগ, ১৪ টি অঞ্চল, ৬৪ জেলা এবং ৪৯৫ টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হবে।

লক্ষ্য: পার্টনার প্রোগ্রামের সার্বিক লক্ষ্য হল খোরপোষ কৃষিকে বাণিজ্যিক কৃষিতে রূপান্তরের মাধ্যমে দেশের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।

প্রধান কার্যক্ষেত্রসমূহ: প্রোগ্রামটি মূলত তিনটি কার্যক্ষেত্রে বাস্তবায়িত হবে যেখানে ১০ টি ডিএলআই সূচক রয়েছে যার আওতায় আবার ২৪ টি ডিএলআর সূচক আছে-

কার্যক্ষেত্র ১: টেকসই ও পুষ্টিকর খাদ্য উৎপাদন

ডিএলআই-১: ফল ও সবজির জন্য উত্তম কৃষি চর্চার ধাপসমূহ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন

ডিএলআই-২: উচ্চ ফলনশীল ধানের জাত উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ

ডিএলআই-৩: ধান ব্যতীত অন্যান্য দানাদার শস্য, ডাল, তেল ও উদ্যান ফসলের মাধ্যমে শস্য বহুমুখীকরণ

- ডিএলআই-৪: আধুনিক সেচ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ
 কার্যক্ষেত্র ২: ভ্যালু চেইন সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তাদের মান উন্নয়ন
 ডিএলআই-৫: কৃষক স্মার্ট কার্ডের মাধ্যমে ডিজিটাল কৃষি সেবা সম্প্রসারণ
 ডিএলআই-৬: বীজ প্রত্যয়নের অ্যাক্রিডিটেশন সিস্টেম ও নিরাপদ খাদ্য পরীক্ষা পদ্ধতি জোরদারকরণ
 ডিএলআই-৭: নারী ও তরুণ কৃষি উদ্যোক্তাদের উদ্যোগগুলোকে বিকশিত করা
 কার্যক্ষেত্র ৩: সরকারি কৃষি প্রতিষ্ঠান আধুনিকীকরণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলিকে যুগোপযোগীকরণ
 ডিএলআই-৮: NARS ভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ কার্যক্রমের মূল্যায়ন
 ডিএলআই-৯: নির্দিষ্ট কৃষি পণ্যের ভ্যালু চেইন কার্যক্রম জোরদারকরণ
 ডিএলআই-১০: মানসম্মত তথ্য ব্যবস্থাপনা (কৃষি পরিসংখ্যান এবং স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজার গবেষণা)

পার্টনার ফিল্ড স্কুল (পিএফএস) সম্পর্কে সাধারণ ধারণা

কৃষি সম্প্রসারণ তথ্য ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণের একটি উত্তম স্থান হলো পার্টনার ফিল্ড স্কুল (পিএফএস) যেখানে একদল কৃষক-কিষাণী মৌসুমব্যাপী নির্দিষ্ট ফসল বা বিষয়ের ওপর উপানুষ্ঠানিকভাবে হাতেকলমে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণলব্ধ অভিজ্ঞতা ও কলাকৌশল ব্যবহার করে তাঁরা পরিবেশবান্ধব চাষাবাদের মাধ্যমে পুষ্টিসমৃদ্ধ নিরাপদ ফসলের উৎপাদন বাড়িয়ে লাভবান হতে পারেন, উত্তম কৃষি চর্চার নিয়ম-নীতি মেনে মানসম্মত ফসল উৎপাদন করে বিপণন ও রপ্তানি করে আয় বাড়াতে পারেন, পারিবারিক পুষ্টি উন্নয়ন করতে পারেন। এ লক্ষ্যে পার্টনার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাধ্যমে দেশের ৪৯৫টি উপজেলায় ৩১,৯৯৭টি পিএফএস গঠন ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। প্রতিটি পিএফএস-এ ২৫ জন কৃষক-কিষাণী অংশগ্রহণ করবেন যার অন্তত ৩০ শতাংশ হবেন নারী। পার্টনার ফিল্ড স্কুল-ধান এর ১০ দিনের ধারাবাহিক সেশনের মাধ্যমে কৃষকদের হাতে কলমে প্রশিক্ষিত ও দক্ষ করে গড়ে তোলা হবে যাতে তাঁরা ধানের অত্যাধুনিক জাত ও পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহার করে ধানের উৎপাদন বাড়াতে পারেন, পুষ্টি ও জলবায়ু সহনশীলতা সম্পর্কে ধারণা পান এবং নিজেদের পিএফএস গ্রুপকে একটি ফার্মার্স সার্ভিস সেন্টারে রূপান্তরিত করে টেকসই উন্নয়ন ঘটাতে পারেন।

পিএফএস-এর নিয়ম কানুন

- পিএফএস ধান চাষের মৌসুমে মৌসুমে বাস্তবায়িত হবে। মৌসুমব্যাপী সময়ের মধ্যে পরিকল্পনা কমে মোট ১০ দিনে ধারাবাহিকভাবে কয়েকটি সেশনের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হবে।
- প্রতিটি দিনের প্রশিক্ষণের সময়কাল হবে ৩-৪ ঘন্টা।
- নির্বাচিত সকল প্রশিক্ষার্থীকে সময়মত উপস্থিত থেকে সক্রিয়ভাবে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করতে হবে।
- প্রশিক্ষণ কার্যক্রম হবে দলগতভাবে ও হাতেকলমে। একজন সহায়তাকারী প্রশিক্ষণ প্রদান করবেন।
- সেরা অংশগ্রহণকারী পুরস্কৃত হবেন।
- প্রতিটি পিএফএস রূপান্তরিত হবে ফার্মার্স সার্ভিস সেন্টারে।



**সহায়তাকারীর জন্য সেশন পরিচালনার নির্দেশনা**

ভূট্টা চাষে ২৫ জন কৃষকদের বর্তমান জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা যাচাইয়ের জন্য ১০টি ব্যালট বাক্সের মাধ্যমে পরীক্ষা বা প্রাক-মূল্যায়ন করতে হবে (বিবিটি)। এসব পরীক্ষার জন্য যথাসম্ভব বেশি জীবন্ত নমুনা ব্যবহার করতে হবে। খেতের পাশে সুবিধাজনক কোনো স্থানে কিছুটা দূরে দূরে সারিবদ্ধভাবে ব্যালট বাক্সগুলো স্থাপন করতে হবে। কৃষকদের সারিবদ্ধভাবে নামের তালিকার ক্রম অনুসারে দাঁড়াতে বলবেন। এরপর নির্দিষ্ট সময় পর পর বাঁশ দিয়ে তাঁদের ব্যালট বাক্সে ভোট তথা সঠিক উত্তর তাঁরা যেটি মনে করেন সেখানে ব্যালট পেপার বাক্সে ফেলতে বলবেন। এই সেশনটি শুরুর আগে সহায়তাকারী ব্যালট বাক্স পরীক্ষায় অংশগ্রহণের নিয়ম সম্পর্কে অংশগ্রহণকারী কৃষক-কিষাণীদের বলবেন ও একটি মহড়ার মাধ্যমে তাঁদের কিভাবে তা করবেন তা দেখিয়ে দেবেন। পরীক্ষা শেষে ব্যালট বাক্সে পরীক্ষার প্রশ্ন ও ফলাফল পিএফএস রেজিস্টারে লিখবেন। এই পরীক্ষাকে আনন্দময় করতে হবে।

সেশন সহায়িকা**ভূমিকা**

ব্যালট বাক্স পরীক্ষা একটি মাঠ পরীক্ষা, যা শিক্ষিত বা নিরক্ষর যে হোক না কেন সেই প্রশিক্ষণার্থীর জন্য ধারণা ও জ্ঞান সহজে যাচাই করা যায়। এটি মূল্যায়নের একটি উত্তম পদ্ধতি। এ পরীক্ষার বড় বৈশিষ্ট্য হলো সাধারণ বর্ণনা বা নমুনার চিত্র দেখানোর পরিবর্তে বাস্তব নমুনা প্রদর্শন/ব্যবহার করা হয়।

ব্যালট বাক্স পরীক্ষার জন্য সহায়ক নমুনা প্রশ্ন

নমুনা দিয়ে প্রশ্ন হবে, প্রশ্ন হবে সহজ, সরল ও সংক্ষিপ্ত, সম্ভাব্য প্রশ্নোত্তর থাকবে তিনটি। ব্যালট বাক্সের প্রশ্ন করার ক্ষেত্রগুলো হতে পারে মাটি, বীজ, সার, আগাছা, শত্রু পোকা, বন্ধু পোকা, খাদ্য ও পুষ্টি, রোগের ক্ষতির নমুনা, পোকাকার ক্ষতির নমুনা, বালাইনাশক, সারের অভাবজনিত লক্ষণ, ইঁদুর খাওয়ার লক্ষণ ইত্যাদি। প্রাপ্ত নমুনার ভিত্তিতে প্রশ্ন সাজাতে হবে।

নমুনা প্রশ্ন:

- ১। নীচের কোনটি বন্ধু পোকা? (ক) মাকড়সা (খ) মাজরা পোকা (গ) খাটো গুঁড় ঘাস ফড়িং
- ২। নমুনার কোন সার গাছকে সবুজ করে? (ক) টিএসপি (খ) এমওপি (গ) ইউরিয়া
- ৩। কোন ভূট্টা চারাটি কাটুই পোকা কাটার লক্ষণ? (ক) হাতে কাটা (খ) কাটুই পোকা কাটা (গ) গরুতে খাওয়া
- ৪। সুতায় বাঁধা নমুনার কোনটি ভূট্টার ফল আর্মি ওয়ার্ম পোকা নিয়ন্ত্রণে কাজে লাগে? (ক) ধানখেতে ডাল পুঁতা (খ) সেক্স ফেরোমন ফাঁদ (গ) গোবর সার
- ৫। কোনটি ভাল বীজ? (ক) অপুষ্ট ও চিটা বীজ মিশ্রিত ভূট্টা বীজ (খ) ভাল পুষ্ট বীজ (গ) বাদামি দাগ পড়া বীজ

পরিচালনার পদ্ধতি

১. উপকারী-অপকারী জীব সংগ্রহ করে শিশিতে সংরক্ষণ করতে হবে। আগাছা নমুনা, আক্রান্ত গাছের চিহ্ন, অভাবজনিত লক্ষণসহ গাছ সংগ্রহ করতে হবে।
২. ১০টি প্রশ্ন তৈরি করতে হবে। নিশ্চিত হতে হবে, ব্যাপক বিষয়, বিশেষ করে মৃত্তিকা, সার, পানি, আগাছা, শস্য, ইঁদুর, উপকারী-অপকারী পোকামাকড় অন্তর্ভুক্ত থাকে।
৩. নিশ্চিত হতে হবে, কিছু প্রশ্ন কার্যক্রম, জীবনচক্র, ক্ষতির লক্ষণ, ব্যবস্থাপনা বিষয়ক হয়।

৪. আর্ট পেপারের টুকরায় স্থানীয় ভাষায় প্রশ্ন লিখতে হবে। আর্ট পেপারের সঙ্গে শিশিসহ নমুনা সংযুক্ত করতে হবে বা রঙিন সুতা দিয়ে মাঠে রাখা নমুনা (গাছ, গাছের অংশ, আগাছা, ক্ষতির লক্ষণ ইত্যাদি) নির্দেশনা দিতে হবে।
৫. প্রত্যেক প্রশ্নের তিনটি সম্ভাব্য উত্তর থাকবে। প্রত্যেক উত্তরের সঙ্গে ছোট বাস্ক, যার উপরে খোলা থাকবে এবং অংশগ্রহণকারী কার্ড (কোড/রোল) ফেলতে পারেন তা তৈরি করতে হবে।
৬. প্রশ্নগুলো বাঁশের খুঁটিতে সংযুক্ত করে মাঠে পুঁতে রাখতে হবে। দুই প্রশ্নের মাঝে ৬ থেকে ৮ মিটার দূরত্ব থাকবে।
৭. প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী ২০টি ছোট কাগজের টুকরো তাদের নামের নম্বরসহ পাবেন। প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর (ভোট) তারা এক টুকরো কাগজ সঠিক উত্তর হিসেবে প্রয়োগ করবেন।
৮. শুরু করার আগে ব্যালট বাস্ক টেস্ট সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে অংশগ্রহণকারীদের ব্যাখ্যা করতে হবে। তাদের প্রশ্ন ও উত্তর উদাহরণ দিয়ে দেখাতে হবে।
৯. প্রত্যেক প্রশ্নের জন্য ৩০ সেকেন্ড সময় পাওয়া যাবে। সহায়তাকারী ৩০ সেকেন্ড পর বাঁশি বাজাবেন এবং অংশগ্রহণকারীরা পরবর্তী প্রশ্নে অগ্রসর হবেন।
১০. সহায়তাকারী অশিক্ষিত অংশগ্রহণকারীর সঙ্গে থেকে প্রশ্ন পড়ে দেবেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: একইভাবে পিএফএস-এর শেষ দিনে প্রশিক্ষণোত্তর মূল্যায়ন ব্যালট বাস্ক পরীক্ষার মাধ্যমে করতে হবে।



সহায়তাকারীর জন্য সেশন পরিচালনার নির্দেশনা

সহায়তাকারী অংশগ্রহণমূলকভাবে দল কি ও দল বিভাজনের গুরুত্ব আলোচনা করবেন। কৃষক মাঠ স্কুলে প্রশিক্ষণ ও কাজের সুবিধার্থে তিনি অংশগ্রহণকারী কৃষকদের ৫টি ছোট দলে ভাগ করবেন। পাঁচ রকমের পাতার প্রত্যেক রকমের ৫টি করে মোট ২৫ টি পাতা একটি পাত্রে মিশিয়ে রাখবেন। সেখান থেকে উপস্থিত সকলকে একটি করে পাতা নিতে বলবেন। নেয়া শেষ হলে যারা একটি পাতা পেয়েছে তাঁদের নিয়ে একটি দল গঠন করবেন ও দলনেতা নির্বাচন করবেন। এভাবে ৫টি দল গঠন করবেন। প্রতিটি দলের একটি নাম দিতে হবে। এরপর দিবস নেতা নির্বাচন করে তাঁর কাজ কি হবে তা বলবেন। দল গঠন ও নামকরণের পর তা পিএফএস রেজিস্টারে লিখে রাখতে হবে।

সেশন সহায়ক নোট

ভূমিকা

এককভাবে অনেক সময় সুষ্ঠুভাবে একটি কাজ করা সম্ভব হয় না। এমন এমন কাজ আছে যেটি এককভাবে করে ভাল ফল পাওয়া যায় না। কোন প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে সাধারণত একটি বড় দলকে পরিচালনা করা কষ্টকর। তাছাড়া দল বড় হলে দলের প্রত্যেক সদস্যের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায় না। কোন ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে তাই প্রশিক্ষণার্থীদেরকে হাতে কলমে ব্যবহারিক কাজ শেখানোর জন্য বা শিক্ষণের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য ছোট ছোট দলে বিভক্তির প্রয়োজন হয়।

দল: কোন অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে কাজ করার জন্য সমমনা কিছু লোকের সমষ্টিকে দল বলে।

পিএফএস-এ দল গঠনের প্রয়োজনীয়তা

১. দল ছোট হলে দলের প্রত্যেক সদস্য হাতে কলমে কাজ করার সুযোগ পায়।
২. সহায়তাকারী প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে থেকে তাকে শেখাতে পারেন বা সহায়তা দিতে পারেন।
৩. দলে কাজ করলে কাজের পরিমাণ বাড়ে ও সময় কম লাগে।
৪. সকলের অংশগ্রহণে সহজে কাজ সম্পন্ন করা যায়।
৫. শক্তি বাড়ে।

দলের নামকরণ

ধান ফসল ব্যবস্থাপনায় আইপিএম, আইসিএম ও আইপিএনএস বিষয়ে প্রশিক্ষণ পরিচালিত হবে। তাই এ সম্পর্কিত কোনো কাজ বা বিষয়কে নামকরণের জন্য ব্যবহার করতে হবে। যেমন- মাকড়সা, বোলতা, সবুজ সার, বঙ্গবন্ধু ধান, ফিঙে পাখি ইত্যাদি।

সহায়তাকারীর জন্য সেশন পরিচালনার নির্দেশনা

সহায়তাকারী উপজেলা কৃষি অফিসের কর্মকর্তা ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের পরামর্শে উপস্থিত ২৫ জন কৃষক-কিষাণীদের মধ্য থেকে সর্বসম্মতিক্রমে পার্টনারের নিয়ম অনুযায়ী গঠিত ৯ সদস্যবিশিষ্ট কার্যনির্বাহী কমিটিকে পরিচিত করাবেন ও কমিটির কোন পদের দায়িত্ব কি তা বলবেন। এটি বুঝানোর জন্য কমিটি নির্বাচনের পর কমিটির সদস্যদেরকে নিয়ে একটি অনুশীলনমূলক সভা/নাটিকা আয়োজন করা যেতে পারে। সে অভিনয়ে নির্বাচিত বা গঠিত সদস্যরা সমিতিতে কে কি দায়িত্ব পালন করবেন তা অভিনয়ের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলবেন।

পাঠ সহায়িকা

ভূমিকা

ফার্মাস সার্ভিস সেন্টার হচ্ছে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তালিকাভুক্ত এমন একটি কৃষক গ্রুপ যারা আত্মহী কৃষকদেরকে ফসল উৎপাদন প্রযুক্তি, কৃষি উপকরণ সংগ্রহ, কৃষি যন্ত্র ব্যবহার এবং বিক্রয় সম্পর্কিত সেবা বা সার্ভিস নির্দিষ্ট সার্ভিস চার্জের বিনিময়ে প্রদান করবেন। সাধারণত যেখানে কোন ফসল ক্লাস্টার আকারে উৎপাদিত হয় সেখানে সেই ফসলটির জন্য ফার্মাস সার্ভিস সেন্টার স্থাপিত হবে। এ উদ্দেশ্যে প্রাথমিক অবস্থায় পার্টনার প্রোগ্রামের মাধ্যমে পার্টনার ফিল্ড স্কুল (পিএফএস) পরিচালিত হচ্ছে। পার্টনারের প্রত্যাশা, ফিল্ড স্কুল সমাপ্ত হওয়ার পর সেটি ফার্মাস সার্ভিস সেন্টারে রূপান্তরিত হবে।

কমিটি গঠন

পিএফএস এর মতই ফার্মাস সার্ভিস সেন্টারের কার্যনির্বাহী কমিটি হবে ৯ (নয়) সদস্য বিশিষ্ট। পিএফএস সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে পিএফএস এর সদস্যরা আলোচনা বা সরাসরি ভোটাভুটির মাধ্যমে ফার্মাস সার্ভিস সেন্টারের কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করবেন অথবা পিএফএস এর জন্য গঠিত কার্যনির্বাহী কমিটিকে দায়িত্ব প্রদান করবেন। কমিটিতে অবশ্যই দুইজন নারী সদস্য অন্তর্ভুক্ত থাকবেন। কার্যনির্বাহী কমিটির প্রকৃতি হবে অরাজনৈতিক। প্রতি কমিটির মেয়াদ হবে তিন বছর। তিন বছর পূর্তির পূর্বেই উপজেলা কৃষি অফিসের সাথে আলোচনার মাধ্যমে পরবর্তী কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করতে হবে। এক্ষেত্রে সমিতির সাধারণ সদস্যদের ভোট বা আলোচনার মাধ্যমে কমিটি গঠিত হবে। কমিটি গঠন বিষয়ে কোন সমস্যা দেখা দিলে ব্লকের উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালনের মাধ্যমে কমিটি গঠনের উদ্যোগ নিবেন। কার্যনির্বাহী কমিটির কাঠামো হলো- চেয়ারম্যান ১ জন, ভাইস চেয়ারম্যান ১ জন, সেক্রেটারি ১ জন, ক্যাশিয়ার ১ জন ও সদস্য ৫ জন (কমপক্ষে ২ জন অবশ্যই নারী সদস্য থাকবেন)।

উপজেলা কৃষি অফিসের দায়িত্ব

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তার মাধ্যমে ফসল উৎপাদনের প্রযুক্তি ও ব্লক ফার্মাস সার্ভিস সেন্টারে যুক্ত কৃষকদেরকে নিয়মিত অবহিত করবেন। প্রতিটি উৎপাদন মৌসুমের শুরুতেই উপজেলা কৃষি অফিস ফার্মাস সার্ভিস সেন্টারের মাধ্যমে বাজারের চাহিদা ভিত্তিক টেকসই ফসল উৎপাদন পরিকল্পনা গ্রহণ করবেন। গৃহীত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য উপকরণ বিক্রেতা, কৃষি যন্ত্র বিক্রেতা এবং ফসলের ক্রেতাদের সাথে ফার্মাস সার্ভিস সেন্টারের যোগাযোগের বিষয়টি উপজেলা কৃষি অফিস সম্বন্ধয় করবে। ফার্মাস সার্ভিস সেন্টার প্রয়োজন মনে করলে ফসল উৎপাদনের আগে এবং মৌসুম চলাকালীন সময়ে কৃষকদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। কৃষি রপ্তানিকারকদের ফার্মাস সার্ভিস সেন্টারের মাধ্যমে চাষাবাদ করতে উপজেলা কৃষি অফিস উৎসাহিত করবে।

কমিটির বিভিন্ন পদের দায়িত্ব

কমিটির চেয়ারম্যান সকল স্টেকহোল্ডারদের সাথে সম্বন্ধয় করবেন এবং গ্রুপকে মবিলাইজ করা সহ গ্রুপের যাবতীয় কাজে নেতৃত্ব প্রদান করবেন। সেক্রেটারি এই সেন্টারের সকল ধরনের সাচিবিক কাজ করবেন এবং মুখপাত্র হিসেবে যাবতীয় যোগাযোগ রক্ষা করবেন। ক্যাশিয়ার সেন্টারের যাবতীয় আর্থিক হিসাব নিকাশ রক্ষণাবেক্ষণ ও সেন্টারের অডিট কার্যক্রম সম্পাদনে ভূমিকা পালন করবেন।

সহায়তাকারীর জন্য সেশন পরিচালনার নির্দেশনা

ভূট্টা পিএফএস-এ কৃষকদের সাথে যেসব বিষয়ে আলোচনা ও মাঠ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে তা সহায়তাকারী আলোচনা করবেন। এ অধিবেশনে সহায়তাকারী কৃষকরা নতুন জাতের ভূট্টা কেন চাষ করবেন তা বলবেন ও পাঠ্যক্রমে পিএফএস-এ কি কি বিষয় সম্পর্কে কৃষকরা জানতে চান তা জিজ্ঞেস করার পর তাঁরা এখানে কি কি বিষয় জানতে পারবেন তা বলবেন।

ভূমিকা

দেশে জনসংখ্যা বাড়ছে, খাদ্য চাহিদা বাড়ছে। পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে উৎপাদন বাড়াতে হবে। উন্নত জাতের বীজ উৎপাদনে সক্ষমতা বাড়াতে হবে। ভূট্টার নতুন নতুন জাত উদ্ভাবনে বেড়েছে উৎপাদন। এখন ভূট্টার হেক্টরপ্রতি ফলন হয় ১৪ মেট্রিক টন পর্যন্ত, যা আগে ছিল ১০ মেট্রিক টনের নিচে। বাংলাদেশ গম ও ভূট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট থেকে এ পর্যন্ত ভূট্টার নতুন তিনটি জাত অবমুক্ত করা হয়েছে। এসব জাত তাপসহিষ্ণু, জলবায়ুজনিত দুর্যোগ ও রোগ সহনশীল। আবহাওয়া পরিবর্তনের কারণে ভূট্টার নতুন নতুন রোগ দেখা দিচ্ছে। এ পর্যন্ত ভূট্টার ২৮টি রোগ নির্ণয় করা হয়েছে। নতুন জাতগুলোতে এই ২৮টি রোগের আক্রমণের শঙ্কা নেই বললেই চলে। খেতে বিভিন্ন ধরনের রোগ-বালাইয়ের আক্রমণে কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হন এবং চাষাবাদে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। এ অবস্থা থেকে রেহাই পেতে সর্বাধুনিক ভালো জাতের ভালো বীজ ব্যবহার করতে হবে।

নতুন উদ্ভাবিত জাতসমূহ

বাংলাদেশের আবহাওয়ায় হাইব্রিড ও দেশি উভয় ভূট্টা চাষ করা যায়। হাইব্রিড জাতে ফলন বেশি হওয়ায় দেশে আবাদকৃত মোট জমির ৯৫ ভাগেই হাইব্রিড জাতের চাষ হয়ে থাকে। হাইব্রিড জাতের মধ্যে সানসাইন, প্যাসিফিক-১১, প্যাসিফিক-৬০, প্যাসিফিক-৯৮৩, প্যাসিফিক-৯৮৪, প্যাসিফিক-৯৮৮, ৯০০ এম, মুজা, এনকে-৪০, পাইওনিয়ার ৩০৬৫, বারি হাইব্রিড ভূট্টা-১, বারি হাইব্রিড ভূট্টা-২, বারি হাইব্রিড ভূট্টা-৩, বিডাল্লিউএমআরআই হাইব্রিড ভূট্টা ১, বিডাল্লিউএমআরআই হাইব্রিড ভূট্টা ২, বিডাল্লিউএমআরআই হাইব্রিড বেবি কর্ণ ১ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। দেশি জাতগুলোর মধ্যে রয়েছে বর্ণালী, শুভ্রা, মোহর, খৈ ভূট্টা, বারি ভূট্টা-৫, বারি ভূট্টা-৬, বারি ভূট্টা-৭ ইত্যাদি।

বিশেষ বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন ভূট্টার জাত

বিশেষ বৈশিষ্ট্য	জাতের নাম
গুণগত মানসম্পন্ন প্রোটিনসমৃদ্ধ	বারি হাইব্রিড ভূট্টা ৫
গো-খাদ্যোপযোগি	বারি ভূট্টা ৭, বারি হাইব্রিড ভূট্টা ১৩, বারি হাইব্রিড ভূট্টা ১৭, বিডাল্লিউএমআরআই হাইব্রিড বেবি কর্ণ ১
মধ্যম মাত্রার খরা সহিষ্ণু	বারি হাইব্রিড ভূট্টা ১২, বারি হাইব্রিড ভূট্টা ১৩
লবণাক্ততা সহিষ্ণু	বারি হাইব্রিড ভূট্টা ১৬
অধিক তাপ সহিষ্ণু	বারি হাইব্রিড ভূট্টা ১৪, বারি হাইব্রিড ভূট্টা ১৫, বারি হাইব্রিড ভূট্টা ১৭
খাটো আকৃতির (হেলে পড়া প্রতিরোধী)	বারি হাইব্রিড ভূট্টা ১৪, বিডাল্লিউএমআরআই হাইব্রিড ভূট্টা ১
উচ্চফলনশীল	বিডাল্লিউএমআরআই হাইব্রিড ভূট্টা ১ ও বিডাল্লিউএমআরআই হাইব্রিড ভূট্টা ২

জাত নির্বাচন

আমাদের কৃষি প্রধান দেশে ভুট্টার চাষ দিন দিন বাড়ছেই। কিন্তু উন্নতমানের ভালো ভুট্টার জাত নির্বাচন না করায় চাষিরা তেমন ভালো ফলন পান না। এতে অনেক চাষি হতাশ হন। অধিক ফলন পেতে ভুট্টার উপযুক্ত জাত নির্বাচন করতে হবে। জাত নির্বাচনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি জাতের বৈশিষ্ট্য নিচে উল্লেখ করা হলো-

বারি হাইব্রিড ভুট্টা-৫: আমিষ সমৃদ্ধ উচ্চ ফলনশীল হাইব্রিড জাত যা ২০০৪ সালে অনুমোদন করা হয়। এ জাতটির জীবনকাল রবি মৌসুমে ১৪০-১৪৫ দিন ও খরিপ মৌসুমে ৯৫-১০৫ দিন। জাতটির দানা উজ্জ্বল আকর্ষণীয় কমলা রঙের, ফ্লিন্ট প্রকৃতির এবং হাজার দানার ওজন ২৯০-৩১০ গ্রাম। হেক্টরপ্রতি ফলন রবি মৌসুমে ৯-১০ টন এবং খরিফ মৌসুমে ৭-৭.৫ টন।

বারি হাইব্রিড ভুট্টা-৭: আন্তর্জাতিক গম ও ভুট্টা উন্নয়ন কেন্দ্র থেকে সংগৃহীত ও বাছাইকৃত পিতৃ-মাতৃ লাইন থেকে একমুখী সংকরায়ণ করে ২০০৬ সালে এ জাতটি উদ্ভাবন করা হয়েছে। এ জাতটির জীবনকাল রবি মৌসুমে ১৩৫-১৪১ দিন ও খরিপ মৌসুমে ৯৫-১০০ দিন।

বারি হাইব্রিড ভুট্টা-৯: আন্তর্জাতিক গম ও ভুট্টা উন্নয়ন কেন্দ্র হতে সংগৃহীত ও বাছাইকৃত পিতৃ-মাতৃ লাইন থেকে একমুখী সংকরায়ণ করে ২০০৭ সালে এ জাতটি উদ্ভাবন করা হয়েছে। এ জাতটির জীবনকাল রবি মৌসুমে ১৪৫-১৫০ দিন ও খরিপ মৌসুমে ১০৫-১১০ দিন। জাতটির দানা আকর্ষণীয় হলুদ রঙের, ডেন্ট প্রকৃতির এবং হাজার দানার ওজন ৩৭০-৩৭৫ গ্রাম। হেক্টরপ্রতি ফলন রবি মৌসুমে ১১.৫-১২.৫ টন।

বারি হাইব্রিড ভুট্টা-১০: আন্তর্জাতিক গম ও ভুট্টা উন্নয়ন কেন্দ্র হতে সংগৃহীত ও বাছাইকৃত পিতৃ-মাতৃ লাইন হতে একমুখী সংকরায়ণ করে ২০০৯ সালে এ জাতটি উদ্ভাবন করা হয়েছে। এ জাতটির জীবনকাল রবি মৌসুমে ১৪৫-১৫০ দিন ও খরিপ মৌসুমে ১০০-১১০ দিন। জাতটির দানা আকর্ষণীয় হলুদ রঙের, ফ্লিন্ট প্রকৃতির। হেক্টরপ্রতি ফলন রবি মৌসুমে ১০-১১.৫ টন।

বারি হাইব্রিড ভুট্টা-১১: আন্তর্জাতিক গম ও ভুট্টা উন্নয়ন কেন্দ্র হতে সংগৃহীত ও বাছাইকৃত পিতৃ-মাতৃ লাইন থেকে একমুখী সংকরায়ণ করে ২০০৯ সালে এ জাতটি উদ্ভাবন এবং অবমুক্ত করা হয়। এ জাতটির জীবনকাল রবি মৌসুমে ১৫০-১৫৫ দিন। জাতটির দানা হলুদ রঙের, ফ্লিন্ট প্রকৃতির। হেক্টরপ্রতি ফলন রবি মৌসুমে ১০.৫-১১.৫ টন।

বারি হাইব্রিড ভুট্টা-১২: স্বল্প সেচে উৎপাদনক্ষম এবং মধ্যমাত্রার খরা সহিষ্ণু উচ্চ ফলনশীল সাদা দানাবিশিষ্ট ফ্লিন্ট প্রকৃতির জাত। এটি ২০১৬ সালে অবমুক্ত করা হয়। এ জাতটির জীবনকাল রবি মৌসুমে ১৪০-১৪৫ দিন। খরা অবস্থায় একটি মাত্র সেচ প্রয়োগে (ফল আসার আগে) জাতটির ফলন হেক্টরপ্রতি ৮.১-৮.৫ টন এবং স্বাভাবিক সেচ প্রয়োগে ফলন হেক্টরপ্রতি ১০-১১.১ টন।

বারি হাইব্রিড ভুট্টা-১৩: ২০১৬ সালে বারি হাইব্রিড ভুট্টা-১৩ অবমুক্ত করা হয়। জাতটি স্বল্প সেচে উৎপাদনক্ষম এবং মধ্যম মাত্রার খরা সহিষ্ণু উচ্চ ফলনশীল সাদা দানাবিশিষ্ট। এ জাতটির জীবনকাল রবি মৌসুমে ১৪৫-১৫২ দিন। খরা অবস্থায় একটি মাত্র সেচ প্রয়োগে (ফল আসার আগে) জাতটির ফলন হেক্টরপ্রতি ৮.২-৮.৯ টন এবং স্বাভাবিক সেচ প্রয়োগে ফলন হেক্টরপ্রতি ১০.১-১১.২ টন।

বারি হাইব্রিড ভুট্টা-১৪: বারি হাইব্রিড ভুট্টা-১৪ অবমুক্ত করা হয় ২০১৭ সালে। জাতটি খরিফ মৌসুমে ফুল আসার পর্যায়ে অধিক তাপ সহিষ্ণু এবং মধ্যম ফলন ক্ষমতাসম্পন্ন। এ জাতটির জীবনকাল রবি মৌসুমে ১৪০ দিন এবং খরিফ মৌসুমে ১১৫ দিন। জাতটি দানা সাদা বর্ণের এবং সেমি ডেন্ট প্রকৃতির। জাতটি পাতা বলসানো রোগ সহনশীল। হেক্টরপ্রতি গড় ফলন রবি মৌসুমে ১০.৮৪ টন এবং খরিফ মৌসুমে ১০.৫২ টন।

বারি মিষ্টি ভুট্টা-১: ২০০২ সালে থাইল্যান্ড থেকে সংগৃহীত জার্মপ্লাজম থেকে বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এ জাতটি নির্বাচন এবং অনুমোদিত হয়। মিষ্টি ভুট্টা কাঁচা অবস্থায় খাওয়া হয়। তাই দানা যখন নরম থাকে তখনই মোচা সংগ্রহ করতে হয়। সিল্ক বের হওয়ার ২০-২৫ দিনের মধ্যে অর্থাৎ বপনের মাত্র ১১৫-১২০ দিনে খাওয়ার উপযোগী মোচা সংগ্রহ করা যায়। এর হলুদ দানা প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন-এ সমৃদ্ধ। জাতটির ফলন রবি মৌসুমে হেক্টরপ্রতি ১০-১০.৫ টন (খোসা ছাড়ানো কচি মোচা) এবং প্রায় ২৫টন/হেক্টর সবুজ গো-খাদ্য পাওয়া যায়।

সহায়তাকারীর জন্য সেশন পরিচালনার নির্দেশনা

অংশগ্রহণমূলক আলোচনার মাধ্যমে সহায়তাকারী কৃষকদের নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের জন্য ভূট্টা চাষের পরিবেশসম্মত কৌশলগুলো কি কি হতে পারে, কিভাবে তা করা যায় সে সম্পর্কে ধারণা দেবেন (এডব্লিউডি পদ্ধতিতে সেচ, জৈব সার ও সবুজ সার ব্যবহার, ন্যূনতম ইউরিয়া সার ব্যবহার করা বা না করা ইত্যাদি)। এসব প্রযুক্তিসমূহ অনুশীলনের জন্য সদস্যদের মধ্য থেকে আগ্রহী একজন কৃষকের জমিতে ভূট্টার আইসিএম পরীক্ষণ প্লট স্থাপন করতে হবে।

পাঠ সহায়িকা

ভূমিকা

বর্তমানে ভূট্টার বহুমুখী ব্যবহার পরিলক্ষিত হচ্ছে। এখন শুধু গোখাদ্যই নয়- পোল্ট্রি ও ফিসফিড, তেল উৎপাদন, বেবি কর্ন, সুইট কর্নসহ নানাভাবে ভূট্টা ব্যবহৃত হচ্ছে। দেশে প্রধান খাদ্য চাল, এরপরেই গম ও ভূট্টার অবস্থান। দেশে জনসংখ্যা বাড়ছে, খাদ্য চাহিদা বাড়ছে। পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে উৎপাদন বাড়াতে হবে। উন্নত পুষ্টিমান ও বহুবিধ ব্যবহারের কারণে ভূট্টার জনপ্রিয়তা বাড়ছে। আধুনিক পদ্ধতিতে ভূট্টার চাষ আমাদের কৃষি অর্থনীতিতে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারে। তবে সেই চাষ হতে হবে পরিবেশসম্মতভাবে।

জমি নির্বাচন, তৈরী ও বীজ বপন পদ্ধতি

সাধারণত পানি জমে থাকেনা এমন বেলে দো-আঁশ বা দো-আঁশ মাটি ভূট্টা চাষের জন্য সবচেয়ে ভাল। ‘জো’ থাকা অবস্থায় মাটির প্রকারভেদে ৩-৪টি আড়াআড়ি চাষ দিতে হবে। ২০-২৫ সেন্টিমিটার গভীর করে চাষ দেয়া ভাল। চাষের পর মই দিয়ে মাটি সমতল করা প্রয়োজন। সারি টেনে বীজ বোনা উত্তম।

- সারি থেকে সারির দূরত্ব ৫৫-৬০ সেন্টিমিটার (২২-২৪ ইঞ্চি)
- বীজ থেকে বীজের দূরত্ব ২২.৫-২৫ সেন্টিমিটার (৯-১০ ইঞ্চি)
- বপনের গভীরতা ৩-৫ সেন্টিমিটার (প্রায় দেড় ইঞ্চি)
- প্রতি গর্তে বীজের সংখ্যা ১টি

বপনের সময়

বাংলাদেশে রবি মৌসুমে মধ্য-আশ্বিন থেকে মধ্য-অগ্রহায়ণ (অক্টোবর-নভেম্বর) এবং খরিফ মৌসুমে ফাল্গুন থেকে মধ্য-চৈত্র (মধ্য-ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চ) পর্যন্ত সময় বীজ বপনের উপযুক্ত সময়।

বীজের হার

সাধারণত ভূট্টা বীজ সারিতে বপন করা হয়; তবে ছিটিয়েও বপন যায়। সারিতে বুনলে বিঘা প্রতি ৩ কেজি আর ছিটিয়ে বুনলে বিঘা প্রতি ৪ থেকে ৫ কেজি বীজের প্রয়োজন হবে।

সার প্রয়োগ

ভূট্টা সার-প্রিয় ফসল। ভূট্টা চাষে সাফল্যের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ সার দেওয়া অত্যন্ত জরুরি। জমির উর্বরতাভেদে সারের মাত্রার কিছুটা তারতম্য হতে পারে। নিচের ছকে সারের মাত্রা দেয়া হলো-

হেক্টরপ্রতি সারের পরিমাণ

সারের নাম	সারের পরিমাণ/ হেক্টর		
	কম্পোজিট জাত		হাইব্রিড জাত
	রবি	খরিফ	রবি
ইউরিয়া	১৭২-৩১২ কেজি	২১৬-২৬৪ কেজি	৫০০-৫৫০ কেজি
টিএসপি	১৬৮-২১৬ কেজি	১৩২-২১৬ কেজি	২৪০-২৬০ কেজি
এমওপি	৯৬-১৪৪ কেজি	৭২-১২০ কেজি	১৮০-২২০ কেজি
জিপসাম	১৪৪-১৬৮ কেজি	৯৬-১৪৪ কেজি	২৪০-২৬০ কেজি
জিংক সালফেট	১০.১৫ কেজি	৭-১২ কেজি	১০-১৫ কেজি
বোরিক এসিড	৫-৭ কেজি	৫-৭ কেজি	৫-৭ কেজি
গোবর	৪-৬ টন	৪-৬ টন	৪-৬ টন

সার প্রয়োগ পদ্ধতি

জমি তৈরীর শেষ পর্যায়ে অনুমোদিত ইউরিয়ার এক তৃতীয়াংশ এবং অন্যান্য সারের সবটুকু ছিটিয়ে জমি চাষ দিতে হবে। অবশিষ্ট ইউরিয়া সমান ২ কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। প্রথম কিস্তি বীজ গজানোর ২৫-৩০ দিন পর এবং দ্বিতীয় কিস্তি বীজ গজানোর ৪০-৫০ দিন পর উপরি প্রয়োগ করতে হবে। চারা গজানোর ৩০ দিনের মধ্যে জমি থেকে অতিরিক্ত চারা তুলে ফেলতে হবে। চারার বয়স এক মাস না হওয়া পর্যন্ত জমি আগাছামুক্ত রাখতে হবে। যতটা পারা যায় বেশি করে জৈব সার প্রয়োগ করে ইউরিয়া সারের ব্যবহার কমাতে হবে।

বিশেষ ব্যবস্থাপনা

- ভুট্টা গাছের সূষ্ঠ পরগায়নে এবং পরগায়িত ভুট্টার মোচায় সঠিকভাবে দানা গঠনের জন্য গাছের বৃদ্ধি পর্যায়ে ভাল মানের বোরণ স্প্রে করতে হবে।
- উপরি প্রয়োগের সময় মাটিতে পরিমিত রস থাকা দরকার, না থাকলে হালকা সেচ দিতে হবে।
- টিএসপির স্থলে ডিএপি ব্যবহার করলে ৪০% ইউরিয়া সার কম ব্যবহার করতে হবে।

সেচ ব্যবস্থাপনা

জলাবদ্ধতা ভুট্টার জন্য খুবই ক্ষতিকর। ভুট্টার জমিতে পানি নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা থাকতে হবে ও অতিরিক্ত সেচ দেওয়া যাবে না। জলবায়ু, জমির পানি ধারণ ক্ষমতা, শিকড়ের গভীরতা ইত্যাদির উপর সেচ ব্যবস্থাপনা নির্ভর করে। তবে পানির অভাবের প্রতি লক্ষ্য রেখে গাছের সংবেদনশীল বৃদ্ধি পর্যায়সমূহের ভিত্তিতে সেচ প্রয়োগ করা অত্যন্ত জরুরি। রবি মৌসুমে ভুট্টার ভাল ফলন পেতে হলে জমি ও মাটির প্রকারভেদে ৪/৫ বার সেচ দেয়ার প্রয়োজন হতে পারে।

- প্রথম সেচ দিতে হবে বীজ বপনের ৩০-৩৫ দিনের মধ্যে (৪-৬ পাতা পর্যায়)
- দ্বিতীয় সেচ দিতে হবে বীজ বপনের ৫৫-৬০ দিনের মধ্যে (৮-১২ পাতা পর্যায়)
- তৃতীয় সেচ দিতে হবে বীজ বপনের ৮০-৮৫ দিনের মধ্যে (মাথার ফুল আসা পর্যায়)
- চতুর্থ সেচ দিতে হবে বীজ বপনের ১০০-১০৫ দিনের মধ্যে (মোচা নরম দুধ অবস্থা পর্যায়)
- পঞ্চম সেচ দিতে হবে বীজ বপনের ১১৫-১২০ দিনের মধ্যে (মোচা দানা শক্ত হওয়া পর্যায়)
- গাছে ফুল আসার পর খেয়াল রাখতে হবে, যেন পরবর্তী ৩০-৩৫ দিন জমিতে কখনো রসের ঘাটতি না হয়।

ফসল সংগ্রহ ও উৎপাদন ক্ষমতা

সম্পূর্ণ পরিপকু (উপরে ২-৩ পাতা বাদ দিয়ে অবশিষ্ট পাতা সম্পূর্ণ শুকিয়ে গেলে) হওয়ার পর ফসল সংগ্রহ করতে হবে।

বিশেষ নির্দেশনা

মোচা থেকে ছাড়ানো বীজের গোড়ায় কালো দাগ দেখা গেলে নিশ্চিতভাবে বোঝা যাবে মোচা পেকেছে। পাকা মোচাগুলো গাছ থেকে সংগ্রহ করতে হবে। অতি বৃষ্টির সময় গাছ থেকে মোচা সময়মত সংগ্রহ করতে না পারলে চাপ দিয়ে গাছ আলতোভাবে নিয়ে মোচাগুলো মাটির দিকে ঝুলিয়ে রাখতে হবে। এতে মোচার ভিতরে বৃষ্টির পানি প্রবেশ করে দানাগুলো নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকবে না। পরে মেঘমুক্ত দিনে গাছ থেকে মোচা সংগ্রহ করতে হবে। মোচা সংগ্রহের সময় মোচাগুলোর খোসা ছাড়িয়ে নেয়া ভাল। সংগৃহীত মোচা রোদে ৩-৪ দিন খুব ভাল করে শুকিয়ে মাড়াই যন্ত্রের সাহায্যে বা হাত দিয়ে দানা খসাতে হবে। দানা আলাদা করে আবার রোদে শুকিয়ে সংরক্ষণ করতে হবে।

সহায়তাকারীর জন্য সেশন পরিচালনার নির্দেশনা

পরিবেশবান্ধব ভূট্টা চাষ প্লট স্থাপন (নতুন জাত ব্যবহার, নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে সেচ, জৈব সার ও সবুজ সার ব্যবহার, ইউরিয়া সার ব্যবহার হ্রাস/ বন্ধ, পার্চিং, আলোক ফাঁদ, ফেরোমোন ফাঁদ, জৈব বালাইনাশক ব্যবহার, সংগ্রহের পর ভূট্টার অবশিষ্টাংশ খেতে না পোড়ানো ইত্যাদির চর্চা)। একটি পিএফএস-এর একজন আগ্রহী কৃষকের মাঠে কমপক্ষে ২০ শতক জমিতে এসব প্রযুক্তি ব্যবহার করে পরিবেশসম্মত ভূট্টা চাষের একটি প্রদর্শনী/ আইসিএম পরীক্ষণ প্লট স্থাপন করবেন। নিয়মিতভাবে পিএফএস কৃষকরা সে প্লট পর্যবেক্ষণ করবেন ও শেষে ফলাফল বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

সেশন সহায়ক নোট

ভূমিকা

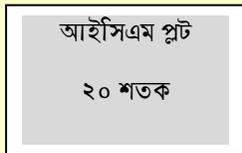
পার্টনার ফিল্ড স্কুলের প্রাণ হল এর বিভিন্ন মাঠ পরীক্ষণ বা ট্রায়াল প্লট। ট্রায়াল বা পরীক্ষণ কৃষকদের মনে যতটা আস্থা ও বিশ্বাস তৈরি করতে পারে অন্য কোনো পদ্ধতির প্রশিক্ষণই তা পারে না। মাঠ পরীক্ষা ছাড়া পিএফএস-এর শিক্ষণ সফলভাবে সম্পন্ন হয় না। তাই সময়মত এই ট্রায়াল প্লটসমূহ স্থাপিত হওয়া প্রয়োজন। পিএফএস-এ ভূট্টার সমন্বিত ফসল ব্যবস্থাপনা (আইসিএম) ও জাত পরীক্ষা দুটি স্থাপন করা দরকার। এর মাধ্যমে কৃষকদের হাতে কলমে পরিবেশসম্মত উপায়ে ফসল ব্যবস্থাপনার কলাকৌশলগুলো শেখানো যায়। পাশাপাশি সাম্প্রতিক উদ্ভাবিত ভূট্টার নতুন জাতগুলোকে পরিচিত করানো বা সম্প্রসারণ ঘটানো যায়।

ভূট্টার আইসিএম প্লট বনাম কৃষক প্লট স্থাপন

উদ্দেশ্য

- আইসিএম প্রযুক্তির সাথে কৃষক ব্যবস্থাপনার তুলনা করা
- আয় ব্যয়ের তুলনা করা
- ফসল ব্যবস্থাপনার সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন অনুশীলন করা
- হাতে কলমে করে ও দেখে আইসিএম প্রযুক্তির উপর আত্মবিশ্বাস জন্মানো

প্লটের নকশা



অনুসরণীয় বিষয়াবলী

- পিএফএস-এ ২৫ জন কৃষক-কিষাণীর মধ্য থেকে ১ জন কৃষক বেছে নিতে হবে যিনি প্রগতিশীল, আগ্রহী ও প্রকৃত চাষি, নিজে চাষে বিনিয়োগ করতে সম্মত।
- তাঁর জমিতেই ধানের আইসিএম প্লটের জন্য কমপক্ষে ২০ শতক জমি নিতে হবে।
- ধানের আইসিএম প্লটে চাষের জন্য জাত হিসেবে বেছে নিতে হবে ভূট্টার আধুনিক জাতগুলো। যে মৌসুমের জন্য যে জাত সুপারিশকৃত, সে মৌসুমের জন্য সে জাতই ব্যবহার করতে হবে। কৃষক প্লটের কৃষক যে জাত চাষ করেন সে জাতকে চাষ করতে দিতে হবে।
- অবশ্যই বিশুদ্ধ সূত্র থেকে ভালো মানের বীজ সংগ্রহ করে সঠিক সময়ে সঠিক দূরত্বে সারিতে বীজ বপন করতে হবে।
- আইসিএম প্লটে আইসিএম-এর সব কলাকৌশল সমন্বিতভাবে প্রয়োগ করতে হবে।

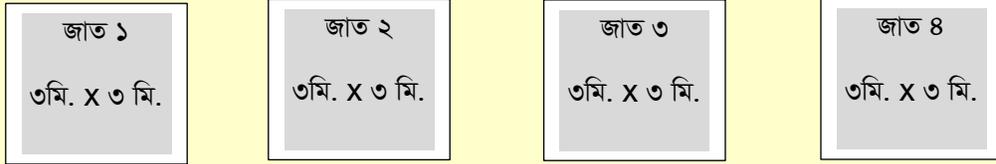
- ভূট্টা খেতে পার্চিংয়ের ব্যবস্থা করতে হবে, বালাই ব্যবস্থাপনার জন্য সমন্বিত কার্যক্রম সময়মত গ্রহণ করতে হবে, ক্ষতিকর পোকা মনিটরিং বা ব্যবস্থাপনার জন্য আলোর ফাঁদ ব্যবহার করা যেতে পারে, নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে পানি ব্যবস্থাপনা (যেখানে যেকোনো প্রয়োজ্য), সেক্স ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করতে হবে, জৈব ও উদ্ভিজ্জ বালাইনাশক প্রয়োগ করতে হবে।
- আইসিএম প্লটে ব্যবস্থাপনার সকল সিদ্ধান্ত সে খেতের কৃষি পরিবেশ বিশ্লেষণ বা আয়েসার ভিত্তিতে গ্রহণ করতে হবে।
- আইপিএনএস (IPNS) অনুসরণ করে জৈব ও অজৈব সারের সমন্বয়ে সমন্বিত সার ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করতে হবে।
- আইসিএম প্লটের আইল সুগঠিত হতে হবে যাতে করে সার বৃষ্টি বা সেচের পানির সাথে অন্য প্লটে চলে না যায় এবং অন্য খেত থেকে রোগজীবাণু পানিবাহিত হয়ে খেতে প্রবেশ না করে।
- আইসিএম প্লটটি বীজ প্লট হিসেবে ব্যবহার করলে আবশ্যিক রগিং বা বিজাত বাছাই করতে হবে। হাইব্রিড জাতের বীজ রাখা যাবে না।
- পরীক্ষণ প্লট সাইনবোর্ড দ্বারা চিহ্নিত করতে হবে।
- পিএফএস রেজিস্টারে আইসিএম প্লটের সকল তথ্য লিখতে বা রাখতে হবে।

ভূট্টার জাত পরীক্ষা প্লট স্থাপন

উদ্দেশ্য

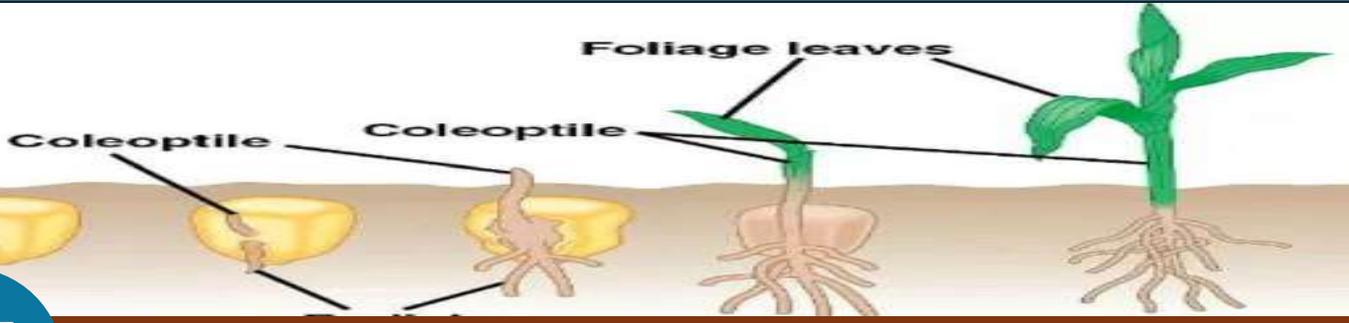
- সাম্প্রতিক উদ্ভাবিত ভূট্টার জাতগুলো কৃষকদের সাথে পরিচিতি করানো।
- এসব জাতের সাথে কৃষকদের প্রচলিত জাতের তুলনা করা
- প্রতিটি জাতের ফলন ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ করা ও এর ভিত্তিতে কৃষকদের কাছে জাতের গ্রহণযোগ্যতা তুলে ধরা।
- হাতে কলমে করে ও দেখে নির্দিষ্ট জাতের ওপর কৃষকদের আত্মবিশ্বাস জন্মানো।

প্লটের নকশা



অনুসরণীয় বিষয়াবলী

- একটি পিএফএস-এ ৪টি জাতের সমন্বয়ে জাত পরীক্ষা প্লট স্থাপন করতে হবে। একটি হবে কৃষকের জাত, অন্য ৩টি হবে পার্টনার কর্তৃক সুপারিশকৃত জাত।
- প্রতিটি পরীক্ষা প্লটের আয়তন হবে ৩ মিটার X ৩ মিটার বা ৯ বর্গ মিটার।
- প্রতিটি জাতের প্লট পৃথকভাবে আইল দ্বারা ঘেরা ও জাতের নাম লেখা সাইনবোর্ড দ্বারা চিহ্নিত থাকবে।
- সব জাতের প্লটে ব্যবস্থাপনা সমানভাবে করতে হবে।
- এক সেশন পরপর কৃষকদের নিয়ে একবার জাতগুলোর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করাতে হবে, ফলন নিতে হবে ও তথ্য রেজিস্টারে লিখতে হবে। চূড়ান্তভাবে জাতগুলো সম্পর্কে কৃষকদের মতামত বা সিদ্ধান্ত নিতে হবে।



সেশন
৮

অংকুরোদগম পরীক্ষা স্থাপন ও পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি

সহায়তাকারীর জন্য সেশন পরিচালনার নির্দেশনা

কৃষকরা যাতে বীজ বোনার আগে সেসব বীজের গজানোর হার ও বীজটা ভালো না মন্দ তা বুঝতে পারেন সেভাবে হাতে কলমে পরীক্ষা করতে হবে যেন এ সেশনের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীদের ভূট্টার ভালো বীজের গুণাবলী ও বীজের স্বাস্থ্য সম্পর্কে ধারণা হয়, তারা যেন ভালো ও খারাপ বীজের পার্থক্য করতে পারে এবং সেশন শেষে যেন তারা ব্যবহারিকভাবে বীজ বাছাই এবং বিভিন্ন মাধ্যমে অংকুরোদগম পরীক্ষা করতে পারে।

পাঠ সহায়িকা

ভূমিকা

ফসল উৎপাদনের প্রাথমিক ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হচ্ছে বীজ। কাজক্ষিত ফলনের অন্যতম বড় বিষয় হলো মানসম্মত বীজ ব্যবহার করা। কৃষক পর্যায়ে অনেক সময়ই মানসম্মত বীজ ব্যবহার করা হয় না। কৃষকদের নিজেদের ব্যবহার ও বিতরণের জন্য বীজের স্বাস্থ্য, বীজ নির্বাচন তথা ভালো বীজের গুণাগুণ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা জরুরি।

বীজ কি?

একটি উদ্ভিদের যে কোন অংশ বা অংগ ব্যবহার করে পরবর্তী সময়ে ঐ উদ্ভিদটি জন্মানো যায়, সেই অংশ বা অঙ্গকে ফসলের বীজ বলা যায়।

ভালো বীজের বৈশিষ্ট্য

- ভালো বীজ হবে সমআকারের, পুষ্ট, পরিপক্ব, চকচকে ও উজ্জ্বল বর্ণের।
- কাজক্ষিত জাতের মধ্যে কোন বিজাত থাকবে না।
- বীজ হবে আগাছার বীজমুক্ত, আবর্জনা ও খড়কুটামুক্ত। ভালো বীজে কোনো অপুষ্ট বা চিটা বীজ থাকবে না।
- বীজে কোন দাগ থাকবে না, বীজ হবে রোগ ও পোকামুক্ত।
- ভালো বীজ সঠিক আর্দ্রতাসম্পন্ন হবে।
- বীজের গজানো বা অংকুরোদগম ক্ষমতা থাকবে কমপক্ষে ৮০ শতাংশ।

বীজের স্বাস্থ্য

বীজের স্বাস্থ্য বলতে রোগ সৃষ্টিকারী বিভিন্ন জীবাণু (যেমন ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, কৃমি ইত্যাদি) এবং পোকামাকড়ের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতিকে বোঝায়। এছাড়া কোন বীজে কোন খাদ্য উপাদানের অভাবজনিত লক্ষণও এর অন্তর্ভুক্ত। বীজের স্বাস্থ্য খারাপ হলে সেসব বীজের গায়ে দাগ থাকবে, অপুষ্ট ও হালকা হবে, পোকায় খাওয়া/আক্রান্ত/বিকলাঙ্গ হবে, গজানোর ক্ষমতা কম থাকবে, চারা অসতেজ হবে ও চারার বাড়বাড়তি ভালো হবে না।

বীজ বাছাই

বীজ বাছাই করে বীজের মানের উন্নয়ন ঘটানো যায়, যেমন- রোগিৎ/বিজাত বাছাই; অন্য ফসল, আগাছা বা রোগ ও পোকা আক্রান্ত অনাকাঙ্খিত গাছ দেখামাত্র তুলে ফেলা; পরিপক্ব ও সুস্থ সবল গাছ হতে আলাদাভাবে কর্তন করে বীজ সংগ্রহ করা; কৃষক পর্যায়ে সাধারণত বাতাসে উড়িয়ে, কুলায় ঝেড়ে বা হাত বাছাইয়ে; পানিতে ভাসিয়ে বা ইউরিয়া দ্রবণে বীজ বাছাই করা যেতে পারে।

ইউরিয়া দ্রবণে বীজ বাছাই

একটি পরিষ্কার পাত্রে/বালতিতে পরিমাণমতো পানি নিতে হবে। এরপর পাত্রে ইউরিয়া (প্রতি লিটারে ৪০ গ্রাম হারে) মিশাতে হবে। এরপর ঐ পানিতে বীজ ঢেলে হাত দ্বারা নাড়াচাড়া করতে হবে। কিছুক্ষণ পর পানির উপরে ভেসে থাকা চিটা/আবর্জনা ইত্যাদি বেছে ফেলে পাত্রের তলায় জমা হওয়া ভালো বীজগুলো তুলে রাখতে হবে। ভালো বীজগুলো পরিষ্কার পানি দিয়ে ২-৩ বার ধুয়ে নিতে হবে। বাছাইকৃত ভালো বীজ জাগ দিয়ে পরবর্তী সময়ে বীজতলায় বপন করতে হবে।

বীজ গজানো/অঙ্কুরোদগম পরীক্ষা

উপযুক্ত পরিবেশে বীজের জ্রণ থেকে অঙ্কুর বের হয়ে সুস্থ-সবল চারা গজানোকে বীজের অঙ্কুরোদগম বলে।

বীজ গজানো/অঙ্কুরোদগম পরীক্ষার উদ্দেশ্য

- ব্যবহারের আগে অঙ্কুরোদগম পরীক্ষা করা হলে বীজ ভালো কি-না, তা সহজেই জানা যায়
- খারাপ বীজ ব্যবহারের কারণে লোকসান থেকেও বাঁচা যায়
- অঙ্কুর বের হওয়ার পরও খারাপ বীজের কারণে অনেক চারা মারা যায়
- সুস্থ-সবল চারা পেতে অঙ্কুরোদগম পরীক্ষা করা প্রয়োজন (বীজের মুখ ফাটলেই বা অঙ্কুর বের হলেই যে বীজ ভালো আছে, এ ধারণা সঠিক নয়)।

বীজ অঙ্কুরোদগম পরীক্ষার পদ্ধতিসমূহ

১। প্লাস্টিক/মাটির খালায়: ভেজা বালুভর্তি মাটি/প্লাস্টিকের প্লেটে ১০০ টি বীজ বসিয়ে হালকা করে বালু দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। বালু যাতে শুকিয়ে না যায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। বালুতে গজানোর কারণে পরীক্ষার সময় চারা উঠালে শিকড় ছিঁড়ে যাবে না, ফলে শিকড়সহ সম্পূর্ণ চারাটি পরীক্ষা করা সম্ভব হবে। মৌসুমভেদে বপনের ৭-১০ দিন পর গজানো চারা বালু থেকে তুলে একটা একটা করে পরীক্ষা করে অপেক্ষাকৃত ছোট-বড়, রোগাক্রান্ত, দুর্বল শিকড়যুক্ত, মৃত-পঁচা বীজ, অগজানো শক্ত বীজ ইত্যাদি বাদ দিয়ে যদি কমপক্ষে ৮০ টি সুস্থ-সবল চারা পাওয়া যায় তাহলে বুঝতে হবে বীজ ভালো আছে।

২। ভেজা চটে (র্যাগডল পদ্ধতি): ভেজা চটে ও কলার খোলে ১০০ টি বীজ বসিয়েও অঙ্কুরোদগম পরীক্ষা করা যেতে পারে তবে এসব পদ্ধতিতে চারা পরীক্ষা করা অসুবিধাজনক।

বীজ গজানোর হার বের করার সূত্র

বীজ গজানোর হার = (গজানো বীজের সংখ্যা X ১০০)/(বসানো বীজের সংখ্যা)

অঙ্কুরোদগম পরীক্ষার ফলাফল

পদ্ধতি	পর্যবেক্ষণের তারিখ	বীজ বা চারার হিসাব				মন্তব্য/ অঙ্কুরোদগম হার
		মৃত/পচা বীজ	শক্ত বীজ	অস্বাভাবিক/ বিকলাঙ্গ চারা	স্বাভাবিক চারা	
ভেজা বালু/ মাটি						
র্যাগ ডল						

অঙ্কুরোদগম পরীক্ষার ফলাফল নিয়ে আলোচনা

- অঙ্কুরোদগম পরীক্ষার ফলাফল কম হলে বীজ হার বেশি হবে
- অবাছাইকৃত বীজের তুলনায় বাছাইকৃত বীজের অঙ্কুরোদগম হার বেশি, তাই বীজ বাছাই করে বপন করা ভালো।
- এতে বীজের পরিমাণ কম লাগে ও বাছাইকৃত বীজের চারা রোগবালাই দ্বারা কম আক্রান্ত হয়। এতে মূল জমিতে রোগবালাইয়ের আক্রমণ কম হয়।
- কাঙ্ক্ষিত চারা পেতে কি পরিমাণ বীজ ফেলতে হবে তা জানা যায়।

সহায়তাকারীর জন্য সেশন পরিচালনার নির্দেশনা

সহায়তাকারী মাঠে ভুট্টার বীজ বপনের সঠিক পদ্ধতি দেখাবেন, এক্ষেত্রে ভুট্টার বীজ বপন যন্ত্র থাকলে তাও ব্যবহার করা যেতে পারে। হাতে কলমে বীজ বপন দেখানোর ও আলোচনার সময় সারি থেকে সারির দূরত্ব, প্রতি সারিতে বীজ থেকে বীজের দূরত্ব, কোন মৌসুমে কখন বীজ বুনতে হবে ইত্যাদি বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা দেবেন।

পাঠ সহায়িকা

ভূমিকা

ফসল উৎপাদনের জন্য প্রাথমিক এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হলো বীজ। ভালো জাতের বীজ সঠিক সময়ে বা মৌসুমে ও সঠিক পদ্ধতিতে বুনতে পারলে সে জাতের সর্বোচ্চ ফলনের সম্ভাবনা থাকে।

জাত

সাধারণত সিঙ্গেল ক্রস F1 হাইব্রিড ভুট্টার জাত, গড় ফলন ১২-১৫ টন/হেক্টর। সাধারণত জীবনকাল রবি মৌসুমে ১৫০ থেকে ১৫৫ দিন এবং খরিপ মৌসুমে ১০০ থেকে ১১০ দিন।

মাটি

বেলে-দোআঁশ ও দোআঁশ মাটি ভুট্টা চাষের জন্য সর্বোত্তম। তবে অন্যান্য মাটিতেও ভুট্টা চাষ করা যেতে পারে। লক্ষ রাখতে হবে যেন জমিতে পানি না জমে থাকে।

বীজ বপনের সময়

বাংলাদেশে রবি মৌসুমে মধ্য-আশ্বিন থেকে মধ্য-অগ্রহায়ণ (অক্টোবর-নভেম্বর) এবং খরিপ মৌসুমে ফাল্গুন থেকে মধ্য-চৈত্র (মধ্য-ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চ) পর্যন্ত ভুট্টা বীজ বপনের উপযুক্ত সময়।

বীজের হার ও বপন পদ্ধতি

সিঙ্গেল ক্রস F1 হাইব্রিড ভুট্টার জন্য হেক্টরপ্রতি ২০-২২ কেজি এবং খৈ ভুট্টা জাতের জন্য ১৫-২০ কেজি বীজ প্রয়োজন। বীজ সারিতে বপন করতে হবে। সারি থেকে সারির দূরত্ব হবে ৬০ সেন্টিমিটার বা ২৪ ইঞ্চি এবং বীজ থেকে বীজের দূরত্ব হবে ২৫ সেন্টিমিটার বা ১০ ইঞ্চি। ২-৩ ইঞ্চি গভীরতায় বীজ বপন করতে হবে।

সহায়তাকারীর জন্য সেশন পরিচালনার নির্দেশনা

বিভিন্ন প্রকার জৈব সারের নমুনা প্রদর্শন করাতে হবে, অংশগ্রহণমূলক আলোচনার মাধ্যমে কৃষকদের কাছ থেকে জৈব সার ব্যবহারের গুরুত্ব বা উপকারিতার কথাগুলো জানাতে হবে। কিভাবে কৃষকরা জৈব সার বাড়িতে বা খামারে উৎপাদন করে ভূট্টা খেতে তা ব্যবহার করবেন সে বিষয়ে সহায়তাকারী অংশগ্রহণমূলকভাবে আলোচনা করবেন।

পাঠ সহায়িকা

ভূমিকা

জৈব সার মাটির প্রাণ। বিজ্ঞানীদের মতে, আদর্শ মাটিতে শতকরা ৫ শতাংশ জৈব পদার্থ থাকা উচিত। অথচ আমাদের দেশের মাটিতে এর গড় পরিমাণ ১-১.৫ শতাংশ, যা ফসল উৎপাদনের জন্য যথেষ্ট নয়। এর প্রধান কারণ কৃষকরা জৈব পদার্থের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তেমন সচেতন নন। তাই এ সমস্যা নিরসনে জৈব সারের গুরুত্ব সম্পর্কে কৃষকদের সচেতন করে তুলতে হবে। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পিএফএসে জৈব সারের গুরুত্ব, উৎপাদন ও ব্যবহার সেশনটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

ভূট্টা উৎপাদনে জৈব সারের গুরুত্ব

জৈব সার জমিতে প্রয়োগ করলে জমিতে গাছের প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান যোগ হয়। এতে জমি উর্বর হয়। এতে রাসায়নিক সারের পরিমাণ কম লাগে। ভূট্টা একটি পুষ্টি বিলাসী ফসল। তাই ভূট্টা চাষে বেশি রাসায়নিক সার ব্যবহার করলে তাতে মাটির স্থায়ী গুণাগুণ ও উর্বরতা নষ্ট হয় এবং পরিবেশ দূষণ হয়। তাই রাসায়নিক সারের ব্যবহার কমিয়ে জৈব সারের ব্যবহার বাড়ানো উচিত। তাছাড়া জৈব সার ব্যবহার না করলে মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা কমে যায়, পক্ষান্তরে তাতে পুষ্টির চুইয়ে যাওয়া বেশি হয়। তাতে সার দিলেও তার কার্যকারিতা কমে যায়। বরং জৈব সার দিলে তাতে রাসায়নিক সারের কার্যকারিতা ও ফসলের গুণগত মান বাড়ে।

খামারজাত সার

বাড়ির বা খামারের গোবরসহ অন্যান্য জৈব আবর্জনা, যেমন ফসলের পরিত্যক্ত অংশ, গোয়ালঘরের আবর্জনা, বাড়িঘরের আবর্জনা (জৈব), রান্নাঘরের উচ্ছিষ্টাংশ, হাঁস-মুরগির বিষ্ঠা ইত্যাদি একটি নির্দিষ্ট স্থানে চালার নিচে গর্তে জমিয়ে পচিয়ে যে মানসম্মত জৈব সার তৈরি করা হয়, তাকেই খামারজাত সার বলে।

খামারজাত সারের ব্যবহার

খামারের আবর্জনা গর্তে জমা করার এক থেকে দেড় মাসের মধ্যে সার প্রস্তুত হতে শুরু হবে। পচনের পর সার হাতে নিলে যদি তার উৎস চেনা না যায়, তবে বুঝতে হবে সার তৈরি হয়েছে এবং তা ব্যবহার উপযোগী হয়েছে। জৈব সার তৈরির পর তা সঙ্গে সঙ্গে জমিতে ব্যবহার করা যাবে। ইচ্ছা করলে তা সুবিধাজনক কোথায়ও পলিথিন দিয়ে ঢেকে রেখে পরেও ব্যবহার করা যাবে। প্রতি শতক ২০ কেজি হারে যে কোনো ফসলের জন্য শেষ চাষের আগে মাটিতে মিশিয়ে তা ব্যবহার করা যেতে পারে। এই সার ব্যবহার করলে রাসায়নিক সারের পরিমাণ কম দিতে হবে। শুধু খামারজাত সার দিয়ে (কোনো প্রকার রাসায়নিক সার না দিয়ে) বসতবাড়িতে সারা বছর সফলভাবে সবজি উৎপাদন সম্ভব। কিন্তু ভূট্টা চাষের জন্য জৈব ও রাসায়নিক সারের সমন্বয় করে ব্যবহার করতে হবে।

খামারজাত সার উৎপাদন কৌশল

খামারজাত সার তৈরির জন্য বসতবাড়ির যেখানে গোশালা আছে তার পাশে এবং রান্নাঘরের কাছে উঁচু জায়গায় সার উৎপাদনের ব্যবস্থা করতে হবে। নির্বাচিত স্থানে ৩.৩ মিটার দৈর্ঘ্য ১.৫ মিটার প্রস্থ বিশিষ্ট জায়গায় ১ মিটার গভীর করে এমনভাবে দুইটি গর্ত তৈরি করতে হবে, যাতে প্রতিটি গর্তের আয়তন ১.৫ মিটার X ১.৫ মিটার X ১ মিটার হয় এবং দুই গর্তের মাঝে ৩০ সেন্টিমিটার চওড়া একটি মাটির দেয়াল থাকে। গর্তের চারদিকে ৩০ সেন্টিমিটার উঁচু করে মাটির আইল দিতে হবে, যাতে বৃষ্টির পানি গর্তে প্রবেশ করতে না

পারে। উল্লেখ্য, গর্তের দেয়াল কিছুটা তেরছা ভাবে কাটতে হবে, না হলে পরবর্তী সময়ে গর্তের পাশ থেকে মাটি ভেঙ্গে গর্তটি ভরাট হয়ে যেতে পারে। এবার বাঁশের খুঁটি ও চালা তৈরির উপকরণ দিয়ে গর্তের ওপর এমনভাবে একটি চালা তৈরি করতে হবে যাতে রোদ বা বৃষ্টির পানি গর্তে প্রবেশ না করে।

গোবর, বাড়িঘরের জৈব আবর্জনা, গোয়াল ঘরের আবর্জনা, গোচনা, হাঁস-ময়ূগির বিষ্ঠা, রান্নাঘরের উচ্ছিষ্টাংশ, ফসলের অবশিষ্টাংশ, গাছের বারা পাতা ও ছোট ডালপালা ইত্যাদি জৈব আবর্জনা, যা কিছু বাড়িতে পাওয়া যায়, তা দিয়ে দিনে দিনে প্রথমে একটি গর্ত ভরতে হবে। গর্তটি ভরে গেলে উপরের তাজা আবর্জনা উল্টে নিচে দিয়ে কাদামাটির প্রলেপ দিয়ে তা ঢেকে দিতে হবে। পচনের কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য কাদামাটি দিয়ে ঢেকে দেয়ার আগে এক মুঠো ইউরিয়া সার আবর্জনার মধ্যে ছিটিয়ে দিতে হবে। উল্লেখ্য, গর্তে গোশালার মূত্র প্রবেশের ব্যবস্থা করতে পারলে ভালো হয়। এরপর দ্বিতীয় গর্তটিতে আবর্জনা ফেলে ভরতে হবে এবং তা আগের মতো মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। এক থেকে দেড় মাসের মধ্যে প্রথম গর্তের আবর্জনা পচে সারে পরিণত হবে (উপাদানভেদে সময় কিছুটা বেশিও লাগতে পারে) এবং এভাবে ৩-৪ মাসের মধ্যে দুইটি গর্তে এক চক্র সার তৈরি হবে। প্রথম গর্তে সার তৈরি সম্পন্ন হলে তা সরিয়ে নিয়ে জমিতে ব্যবহার বা সুবিধাজনক স্থানে পলিখিন দিয়ে ঢেকে প্রয়োজনের সময় ব্যবহারের জন্য রেখে দিতে হবে। খালি গর্তে আবার আবর্জনা ফেলা শুরু করতে হবে। এভাবে ক্রমাগত দুইটি গর্তে সারা বছর খামারজাত সার (জৈব সার) প্রস্তুত হতে থাকবে।



সহায়তাকারীর জন্য সেশন পরিচালনার নির্দেশনা

পরিবেশসম্মতভাবে ভূট্টা চাষের জন্য কৃষকদের বেশি করে জৈব সার ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করবেন। কৃষকদের বিভিন্ন রকমের জৈব ও রাসায়নিক সারের নমুনা দেখিয়ে সেগুলো চেনাবেন ও সেসব সারের কাজ বলবেন। মাঠে কোনো সারের অভাবজনিত লক্ষণযুক্ত ভূট্টাগাছ থাকলে তা প্রশিক্ষণার্থীদের দেখাবেন। সুপারিশকৃত মাত্রায় জৈব ও রাসায়নিক সার প্রয়োগ করতে বলবেন, বিশেষ করে কোনভাবেই যেন কৃষকরা অতিরিক্ত সার ব্যবহার না করেন ও বিশেষভাবে ইউরিয়া সারের ব্যবহার যেন অবশ্যই কমান।

পাঠ সহায়িকা

ভূমিকা

ভালো ফলন পেতে হলে জমিতে সুষম মাত্রায় জৈব ও রাসায়নিক সার প্রয়োগ করতে হয়। জমিতে সার প্রয়োগে গাছ তার প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান পায়। একেক সারের কাজ একেক রকম। প্রয়োজনের কম বা বেশি সার জমিতে প্রয়োগ করলে গাছে বিভিন্ন লক্ষণ প্রকাশ পায়। এতে করে আর্থিক ক্ষতিসহ ফলনের এবং মাটির উপর বিরূপ প্রভাব পড়ে। তাই জমিতে সঠিক পরিমাণে সুষম মাত্রায় সার প্রয়োগ নিশ্চিত করা প্রয়োজন এবং কোন সারের কি কাজ ও বিভিন্ন সারের অভাবজনিত লক্ষণ কি, কি পরিমাণ সার কখন দিতে হবে সেসব বিষয়ে কৃষকদের জানা প্রয়োজন।

উদ্ভিদ পুষ্টি ও সার

উদ্ভিদের গঠন ও জীবনচক্র সম্পন্নকরতে যেসব মৌলিক উপাদান প্রয়োজন তাদের উদ্ভিদ পুষ্টি বা খাদ্য উপাদান বলা যায়। গাছের বৃদ্ধি, পুষ্টি, ফলন ও গুণাগুণ বৃদ্ধির জন্য যেসব পদার্থ গাছের খাদ্য হিসেবে মাটিতে প্রয়োগ করা হয়, তাকে সার বলা হয়।

সারের প্রকারভেদ

সাধারণত সার দুই প্রকার। যথা- জৈব সার ও রাসায়নিক সার। জীবদেহ থেকে প্রাপ্ত বা প্রস্তুতকৃত সারকে জৈব সার বলে। যেমন গোবর, খামারজাত সার। যেসব সার কৃত্রিম উপায়ে কলকারখানায় প্রস্তুত করা হয়, তাকে রাসায়নিক সার বলে। যেমন ইউরিয়া, টিএসপি, এমওপি।

বিভিন্ন সারের কাজ

নাইট্রোজেন জাতীয় (ইউরিয়া, ডিএপি, গুটি ইউরিয়া) সারের কাজ: এই সার গাছের পাতা সবুজ ও বড় কণ্ডে, গাছের কাণ্ড ও ডালপালা দ্রুত বৃদ্ধি করে ও ফলন বাড়ায়।

অভাবজনিত লক্ষণ: নাইট্রোজেন সারের অভাবে গাছের গোড়ার দিকের বয়স্ক পাতা প্রথমে হলুদ হয় এবং শেষে পুরো গাছই হলুদ বা হালকা সবুজ হয়ে যায়, গাছের বৃদ্ধি কম হয় এবং গাছ খাটো হয়, গাছের পরিপক্বতা তাড়াতাড়ি আসে ও ফলন কমে যায়।

অতিরিক্ত প্রয়োগ করলে: নাইট্রোজেনজাতীয় সার বেশি প্রয়োগ করলে গাছ হেলে পড়ে ও দুর্বল হয়ে যায়, রোগ ও পোকাকার আক্রমণ বেশি হয় ও ফলন কমে যায়।

ফসফরাস জাতীয় (টিএসপি, এসএসপি ও ডিএপি) সারের কাজ: ফসফরাসজাতীয় সার চারা অবস্থায় শিকড় দ্রুত গঠন ও বৃদ্ধিতে সাহায্য করে, ফুল, ফল বৃদ্ধি করে ও দানা পুষ্ট করে, গাছের পরিপক্বতা আনতে সাহায্য করে।

অভাবজনিত লক্ষণ: ফসফরাসজাতীয় সারের অভাবে ভূট্টা গাছের পাতা খাড়া ও কালচে-সবুজাভ হয়, গাছ খাটো হয় এবং দানা কম পুষ্ট হয়, সময়মতো ফুল ফল আসে না ও ফলন কমে যায়।

পটাশ (এমওপি) সারের কাজ: এই সার গাছকে শক্ত করে, গাছের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে, ফুল ঝরা কমায়, শিকড়ের বৃদ্ধি ঘটায়, গাছের ভেতর খাদ্যবস্তু স্থানান্তরে সাহায্য করে।

অভাবজনিত লক্ষণ: পটাশ সারের অভাবে বয়স্ক পাতার আগা থেকে হলদে কমলা বা হলদে বাদামি রঙ ধারণ করে। উপরের থেকে নিচের দিকে ক্রমান্বয়ে শুকিয়ে যায়, ফুল/ফল ঝরে, গাছের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস পায়, ভুট্টার দানার আকার ছোট হয়, ওজন কমে যায় এবং ফলন কম হয়।

গন্ধক (জিপসাম) সারের কাজ: গাছের গাঢ় সবুজাভ রক্ষায় সহায়তা করে এবং গাছের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে, গাছে বিভিন্ন ভিটামিন ও হরমোন তৈরিতে সাহায্য করে।

অভাবজনিত লক্ষণ: এই সারের অভাবে ভুট্টা গাছের কচি পাতা হলুদ হয়, গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়, কুশি কমে যায়, মোচা দেহিতে পাকে। সাধারণত খেতের যে অংশে পানি জমে থাকে সেখানে গাছের পাতা হলুদ হয়ে যায়।

দস্তা (জিংক) সারের কাজ: দস্তা বা জিংক সার বীজ গঠন ও পাতার সবুজ কণা তৈরিতে সাহায্য করে, মাটি থেকে বিভিন্ন পুষ্টি উপাদান গ্রহণে সাহায্য করে, ফুল ফোটানো, ফল ও বীজ গঠনে সহায়তা করে এবং গাছকে সমভাবে বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

অভাবজনিত লক্ষণ: দস্তার অভাবে ভুট্টার কচি পাতার গোড়া বা মধ্যশিরা সাদা হয়ে যায়, গাছের বৃদ্ধি সমান হয় না বলে কোথাও উঁচু, কোথাও নিচু দেখায়, বয়স্ক পাতায় মরিচা রঙের দাগ পড়ে ও দেহিতে পরিপক্বতা আসে।

বোরণ সারের কাজ: বোরণ গাছের কোষের দেয়াল শক্ত করে, ডগা ও শিকড় বৃদ্ধি করে, নিষিক্তকরণ ও দানা গঠনে সাহায্য করে ও ফলন বাড়ায়।

অভাবজনিত লক্ষণ: বোরণের অভাবে ফল ঝরে, ভুট্টার মোচায় ফাঁকা ফাঁকা দানা হয়, দানা পুষ্ট হয় না।

ম্যাগনেসিয়াম সারের কাজ: ম্যাগনেসিয়াম পাতার সবুজ কণিকা গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে, গাছের ভেতর ফসফরাসের বাহক হিসেবে কাজ করে ও গাছের অন্যান্য খাদ্য উপাদান গ্রহণ নিয়ন্ত্রণ করে।

অভাবজনিত লক্ষণ: এর অভাবে পাতার সবুজ রং নষ্ট হয়, গাছের পাতা কমলা রঙ ধারণ করে, পাতা নুইয়ে পড়ে। ভুট্টার পাতায় সাদা ডোরা দাগ দেখা যায়।

হাইব্রিড ভুট্টা চাষে সারের পরিমাণ

সারের নাম	পরিমাণ (কেজি/হেক্টর)
ইউরিয়া	৬০০-৬৫০
টিএসপি	২৫০-২৭০
এমওপি	২৫০-৩০০
জিপসাম	২০০-২৫০
জিংক সালফেট (মনোজিংক)	৮-১০
বোরিক এসিড (বোরন সার)	৮-১০
ম্যাগনেসিয়াম	৪৫-৫০
জৈব সার	১০০-১২০ টন

সার প্রয়োগ পদ্ধতি

জমি তৈরীর শেষ পর্যায়ে অনুমোদিত ইউরিয়ার এক তৃতীয়াংশ এবং অন্যান্য সারের সবটুকু ছিটিয়ে জমি চাষ ও মই দিতে হবে। বাকি ইউরিয়া সমান দুই কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। প্রথম কিস্তি ইউরিয়া বীজ গজানোর ৩০-৩৫ দিন পর (৮-১০ পাতা অবস্থায়) উপরি প্রয়োগ করতে হবে এবং দ্বিতীয় কিস্তি ইউরিয়া বীজ গজানোর ৬০-৬৫ দিন পর (ফুল আসার পূর্বে) উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

ভূট্টা খেতের বর্তমান পোকাকার সমন্বিত ব্যবস্থাপনা

সহায়তাকারীর জন্য সেশন পরিচালনার নির্দেশনা

ভূট্টার গুরুত্বপূর্ণ পোকাকারগুলোর পরিবেশসম্মত সমন্বিত ব্যবস্থাপনার সাধারণ কৌশলসমূহ সহায়তাকারী আলোচনা করবেন। এক্ষেত্রে কোন পোকাকার জন্য কৃষকদের কি কি অভিজ্ঞতা রয়েছে তা বিনিময় করবেন। জোর দেবেন নিয়ন্ত্রিত পানি ও সার ব্যবহার, পার্চিং, আলোক ফাঁদ, জৈব বালাইনাশক ইত্যাদি ব্যবহারের ওপর।

পাঠ সহায়িকা

ভূমিকা

ভূট্টা বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ একটি দানাশস্য। ভূট্টা চাষে পোকামাকড় এক অন্যতম প্রধান সমস্যা। ভূট্টার গুরুত্বপূর্ণ ক্ষতিকর পোকামাকড়গুলো হলো কাটুই পোকা, লেদা পোকা, মোচা ছিদ্রকারী পোকা, কাণ্ড ছিদ্রকারী পোকা, সাদা গ্রাব, ফল আর্মিওয়ার্ম বা লেদা পোকা, ভূট্টা বীজের ম্যাগোট, ভূট্টা পাতার জাব পোকা ইত্যাদি। এছাড়া ঘাসফড়িং, মাকড়, খ্রিপস, উঁই ইত্যাদি পোকামাকড়ও ভূট্টা ফসলের ক্ষতি করে। সঠিক সময়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করলে পোকাকার আক্রমণে ভূট্টা ফসলের ক্ষতি হতে পারে।

কাটুই পোকা

পোকাকার কীড়া বা লার্ভা মাটি সংলগ্ন ভূট্টার চারা গাছের গোড়া কেটে দেয়। একটি লার্ভা একাধিক গাছের গোড়া কেটে দিতে পারে। লার্ভাগুলো দিনের বেলায় মাটির ফাটলে, ঢেলা ও আবর্জনায়ে লুকিয়ে থাকে এবং রাতের বেলায় ক্ষতিসাধন করে। অতিরিক্ত আক্রমণে জমিতে গাছের সংখ্যা কমে যায় এবং ফলন কম হয়। পোকাকার অত্যধিক আক্রমণ দেখা দিলে ক্লোরপাইরিফসজাতীয় কীটনাশক (ডারসবান ২০ ইসি বা পাইরিফস ২০ ইসি বা ক্লাসিক ২০ ইসি বা অন্য নামের) প্রতি লিটার পানিতে ৫ মিলি অথবা নাইটো ৫৫ ইসি প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি প্রয়োগ করতে হবে।



জাব পোকা

পূর্ণবয়স্ক জাব পোকা ও নিষ্ফ উভয়েই গাছের পাতা, নতুন ডগা, টাসেল ও কচি মোচার সবুজ অংশ থেকে রস চুষে খায়। এরা মধু রস নিঃসৃত করে। ফলে আক্রান্ত অংশে শুটিমোল্ড ছত্রাক জন্মায় এবং কালো রং ধারণ করে। টাসেলে মধু রস জন্মালে পরাগায়নে বিঘ্ন ঘটে, ফলে মোচায় সঠিকভাবে দানা তৈরি হয় না। এরা ভাইরাস রোগের বাহক হিসেবে কাজ করে।



সমন্বিত ব্যবস্থাপনা: পূর্ণবয়স্ক জাব পোকা ও বাচ্চারা প্রাথমিক অবস্থায় ডগা এবং পাতায় দলবদ্ধভাবে অবস্থান করে। এই অবস্থায় এদেরকে হাত দিয়ে পিষে মেরে ফেলতে হবে। জাব পোকাকার শত্রু বিভিন্ন উপকারী পোকা যেমন লেডি বার্ড বিটল, সিরফিড ফ্লাই, ব্রাকন বোলতা ইত্যাদি খেতে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রতি লিটার পানির সাথে ৫ গ্রাম ডিটারজেন্ট বা সাবানের গুঁড়া মিশিয়ে আক্রান্ত গাছে প্রয়োগ করতে হবে। দুই কাপ ময়দা ৫-১০ লিটার পানির সাথে গুলে সকালে জাব পোকা আক্রান্ত জমিতে স্প্রে করতে হবে। সূর্যের তাপ বাড়ার সাথে সাথে এই মিশ্রণ শুকাতে থাকবে।

এতে জাব পোকাকার কুঁচকে মারা যাবে। এছাড়া প্রতি লিটার পানির সাথে জৈব কীটনাশক বায়োনিম-১ ইসি বা ফাইটোম্যান্ড-৩ ইসি (১ মিলি) অথবা মেলাডান-৫৭ ইসি (২ মিলিলিটার) হারে ভালোভাবে মিশিয়ে আক্রান্ত গাছে স্প্রে করে জাব পোকা দমন করা যায়।

মাজরা পোকা

মাজরা পোকাকার কীড়া বা লার্ভা কচি কাণ্ড ছিদ্র করে ভিতরে ঢুকে এবং ডিগ পাতার গোড়া কেটে দেয়। ফলে গাছের বিবর্ণ ডগা লক্ষণ প্রকাশ পায়। আক্রান্ত ডগা শুকিয়ে যায় এবং টান দিলে উঠে আসে। এরা বড় গাছে আক্রমণ করে কাণ্ডে ছিদ্র করে ভেতরের অংশ খায়। ফলে অল্প বাতাসে বড় গাছ ভেঙ্গে পড়ে, এরা মধ্যস্থ পাতা ছিদ্র করে টাসেল আক্রমণ করে, টাসেল কেটে দেয়। ফলে পরাগায়ন ব্যাহত হয়। মোচা ধরার পর এরা মোচায় আক্রমণ করে দানা নষ্ট করে ফেলে। এরা রাতের বেলায় কার্যক্ষম।

সমন্বিত ব্যবস্থাপনা: এদের দমন করার জন্য ডিমের গাদা সংগ্রহ করে নষ্ট করতে হবে। ডিমের গাদা সংগ্রহ করে পুড়িয়ে, পা দিয়ে পিষে বা মাটির নিচে পুঁতে রেখে ধ্বংস করতে হবে। চারা অবস্থায় ফেরোমন ফাঁদ ১০ বর্গ মিটার দূরত্বে স্থাপন করে এ পোকা দমন করা যায়। আক্রান্ত মাঠে জৈব বালাইনাশক যেমন স্পিনোসেড (ট্রেসার অথবা সাকসেস) প্রতি ১০ লিটার পানিতে ৪ মিলি হাওে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। বীজ গজানোর যথাক্রমে ৭ ও ১৫ দিন পর দুই বার খেতে ট্রাইকোথামা বোলতা হেক্টর প্রতি ৮টি ট্রাইকোকোর্ড বুলানো যেতে পারে। একটি ট্রাইকো কার্ডে প্রায় দেড় লক্ষ ট্রাইকোথামা বোলতা থাকে যারা পরজীবীতার দ্বারা এ পোকাকে মেরে ফেলে।

ফল আর্মিওয়ার্ম

এটি ভুট্টা ফসলের একটি নতুন বিধ্বংসী পোকা। বাংলাদেশে ২০১৮ সালে সবপ্রথম পোকাকার আক্রমণ পরিলক্ষিত হয়। এটি একটি সর্বভুক পোকা, এরা ২৬টি পরিবারের ৮০টি ফসলে আক্রমণ করে থাকে, যার মধ্যে ভুট্টা সর্বাধিক আক্রান্ত ফসল। এরা ভুট্টা গাছে সকল ধাপে (চারা, অঙ্গজ বৃদ্ধি, টাসেল ও মোচায় দানা তৈরি পর্যায়) আক্রমণ করে থাকে। সদ্যজাত লার্ভা পাতায় ছোট ছিদ্র করে এবং শুধুমাত্র পাতার উপরের সবুজ অংশ খায়। পরবর্তীতে এরা ব্যাপকভাবে পাতা খেয়ে ফেলে। ফলে পাতায় বড় বড় ছিদ্র দেখা যায়। লার্ভাগুলো রাতের বেলায় বেশি ক্ষতি করে। অতিরিক্ত আক্রমণে মাঠের প্রায় সম্পূর্ণ গাছ বাধরা হয়ে যায়। লার্ভাগুলো গাছের খোলার ভেতরে অবস্থান করে কীটনাশক ও প্রাকৃতিক শত্রু হতে নিজেদের রক্ষা করে। এরা গাছে মল ত্যাগ করে, যা পরবর্তীতে শুকিয়ে করাতে গুঁড়ার মতো দেখায়। এরা মধ্যস্থ পাতা ছিদ্র করে টাসেলে আক্রমণ করে, টাসেল কেটে দেয় ফলে পরাগায়ন ব্যাহত হয়। মোচা হওয়ার পরে এরা মোচা ও কাণ্ডের সংযোগস্থল ছিদ্র করে মোচার ভেতরে ঢুকে এবং ভেতরের নরম দানা খেয়ে ফেলে।



সমন্বিত ব্যবস্থাপনা: এ পোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য একই জমিতে পর পর ভুট্টা চাষ করা যাবে না। এ পোকাকার পুরুষ মথ ধরা বা মারার জন্য জমিতে সেক্স ফেরোমন ফাঁদ পাততে হবে। বিঘা প্রতি ৫ থেকে ৬টি ফাঁদ দেয়া যেতে পারে। ফলআর্মি ফেরোমন লিউর ব্যবহার করলে প্রতি হেক্টরে ৪০টি লিউর লাগবে। খেতে উপকারী পোকা বোলতা (ব্রাকন হিবিটর) ছাড়তে হবে। এক হেক্টর জমির জন্য প্রতি সপ্তাহে ১ বাৎকার/শিশি ব্রাকন বোলতা (৮০০-১০০০টি) ছাড়তে হবে। আক্রান্ত জমিতে জৈব বালাইনাশক (ট্রেসার) প্রতি ১০ মিলিলিটারে ২ মিলিলিটার হারে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। ভুট্টাগাছে এ পোকাকার কীড়া দেখলে তা হাত দিয়ে সংগ্রহ করে পিষে মেরে ফেলতে হবে। সহজ উপায় হলো কাদা গুলে পাতার পাকানো অংশের ভিতরে ঢেলে দিতে হবে। তাহলে ভেতরে পোকা থাকলে সেগুলো ২ থেকে ৩ দিনের মধ্যে মারা যাবে। বিধ্বংসী আক্রমণ যাতে না হয় সেজন্য অনুমোদিত কীটনাশক যেমন এসিমিক্স, রিলোড, ট্রেসার, সাকসেস, এমামেকটিন বেনজোয়েট (প্রোক্সেম, হেক্সেম), ভিরতাকো, নাইট্রো ইত্যাদি কীটনাশক স্প্রে করা যেতে পারে।

মোচা ছিদ্রকারী পোকা

এরা গাছের নরম পাতা ও মোচায় আক্রমণ করে। পোকাকার লার্ভা গাছের পাতা ছিদ্র করে খায় ফলে পাতায় গোলাকার দাগ দেখা যায়।



গাছে মোচা ধরার পর এরা মোচায় আক্রমণ করে সাধারণত মোচার উপরের অংশে এদের দেখা যায়। এরা সিল্ক কেটে মোচা থেকে আলাদা করে ফলে পরাগায়ন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। মোচায় দানা তৈরি পর্যায়ে এরা নরম দানা খেয়ে ফেলে ফলে ভুট্টার ফলন ব্যাপকভাবে কমে যায়। ফসলের প্রকারভেদে লার্ভার গায়ের রং সবুজ, গোলাপী, কমলা, হালকা বাদামি বা কালচে ধূসর রঙের হতে পারে। এ পোকা দমনের জন্য জমিতে সেক্স ফেরোমন ফাঁদ প্রয়োগ করে পুরুষ পোকা ধরার ব্যবস্থা করতে হবে। অতিরিক্ত আক্রমণে স্পিনোসেড (ট্রেসার ৪৫ এসসি ০.৪ মিলি/লিটার বা সাকসেস ২.৫ এসসি ১.৩ মিলি/লিটার) অথবা এমামেকটিন বেনজোয়েট (প্রোক্সেম ৫ এসজি, সাহাম ৫ এসজি, হেক্সেম ৫ এসজি বা অন্য নামের কীটনাশক ১ গ্রাম/লিটার হারে) প্রয়োগ করা যেতে পারে।

সহায়তাকারীর জন্য সেশন পরিচালনার নির্দেশনা

সহায়তাকারী কৃষকদের দ্বারা ভূট্টা খেত থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ আগাছা সংগ্রহ করে কেন সেগুলো আগাছা তা বলবেন, কেন ও কিভাবে তা দমন করতে হবে সে সম্পর্কে আলোচনা করবেন।

পাঠ সহায়িকা

ভূমিকা

পোকামাকড় ও রোগের মতো আগাছাও ভূট্টা খেতের বলাই। আগাছা ভূট্টা ফসলের সাথে স্থান, পানি ও খাদ্য নিয়ে প্রতিযোগিতা করে। অধিকাংশ কৃষক যথাযথভাবে সময়মতো আগাছা দমন করেন না। প্রায়শঃ দেরি করে আগাছা নিড়ানো হয়। এ কারণে ফসল আগাছার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আগাছা ভূট্টার ফলন কমিয়ে দেয়, উৎপাদন খরচ বাড়িয়ে দেয়, বীজের মান কমিয়ে দেয় এবং বহু রোগ ও পোকামাকড়ের বিকল্প পোষক হিসেবে কাজ করে, ইঁদুরকে আশ্রয় দেয়। ফসলের জমিতে আগাছা একটি চিরাচরিত সমস্যা।

আগাছার বৈশিষ্ট্য

যেসব স্বভাব বা বৈশিষ্ট্যের জন্য আগাছা ধান চাষের জন্য একটি সমস্যা তা হলো- আগাছা চাষ ছাড়াই জন্মাতে পারে, দ্রুত বর্ধনশীল, প্রতিকূল অবস্থায় জন্মাতে পারে ও বেঁচে থাকতে পারে, অসংখ্য বীজ উৎপাদন করতে পারে, দ্রুত বংশ বিস্তার করতে পারে, রোগ ও পোকাকার আক্রমণ কম হয়, দমন করা খুবই কঠিন, আগাছার বীজ হালকা তাই বাতাসের মাধ্যমে সহজেই বিস্তার লাভ করতে পারে।

বাংলাদেশে ভূট্টা খেতের গুরুত্বপূর্ণ আগাছাসমূহ

বাংলাদেশে ভূট্টা খেতে যেসব গুরুত্বপূর্ণ আগাছা সাধারণত দেখা যায় সেগুলো হলো বথুয়া, ভাদাইল, দুর্বা, শাকনটে, কাঁটানটে, আমরুল, বড় দুধিয়া, ছোট দুধিয়া, নুনিয়াশাক, হাতিগুঁড়, শ্বেতদ্রোণ, রক্তদ্রোণ, ফোকাবেগুন, চাপড়া, জাভানি ইত্যাদি।

সমন্বিত আগাছা ব্যবস্থাপনা

ভূট্টা খেতে সাধারণত চওড়াপাতা আগাছা বেশি জন্মে। ভূট্টা চাষের একটি বড় সমস্যা উঁচু ও শুষ্ক জমি হওয়ায় ভূট্টাগাছকে খাদ্য ও স্থান নিয়ে অনেক ধরনের আগাছার সাথে প্রতিযোগিতা করে টিকে থাকতে হয়। তাই সময় মতো আগাছা দমন না করতে পারলে ভূট্টার ফলন অনেক কমে যায়। গবেষকরা বিভিন্ন গবেষণার মাধ্যমে দেখেছেন যে, রবি মৌসুমে ভূট্টার জন্য সবচেয়ে ভালো পরিবেশসম্মত আগাছা ব্যবস্থাপনা হলো হাতে নিড়ানো ও মালচিং। আবার হাতে আগাছা নিড়িয়ে সমন্বিতভাবে ভূট্টার সাথে বিভিন্ন আন্তঃফসলের চাষ ও মালচিং ও প্রয়োজ হলে আগাছানাশক (যেমন- প্রিজম ২৭.৫ ইসি) প্রয়োগ করেও আগাছা দমন করা যায়। তবে হাতে নিড়ানো ও মালচিং সবচেয়ে ভালো পদ্ধতি।

ভূট্টার চারা গজানোর পর ৩০ থেকে ৩৫ দিন পর্যন্ত জমি আগাছামুক্ত রাখতে হবে। বীজ বোনার ২৫-৩০ দিন পর নিড়ানী অথবা আগাছানাশক (যেমন- ক্যালারিস এক্সট্রা) প্রতি লিটার পানিতে ৬ মিলিলিটার হারে অথবা জি-মেইজ বা জোয়ানকানা প্রতি লিটার পানিতে ৫ মিলিলিটার হারে, ট্রায়াজিন প্রতি লিটার পানিতে ৪ মিলিলিটার হারে মিশিয়ে স্প্রে করে আগাছা দমন করা যায়। আগাছানাশক প্রয়োগের সময় জমিতে পর্যাপ্ত রস থাকা দরকার।

ভূটার উপকারী ও অপকারী পোকামাকড় সংগ্রহ, বাছাই ও সনাক্তকরণ

সহায়তাকারীর জন্য সেশন পরিচালনার নির্দেশনা

সহায়তাকারী পিএফএস-এর ৫টি দলকে দিয়ে ভূটা খেত থেকে হাতজাল দিয়ে বা হাতে বিভিন্ন পোকামাকড় সংগ্রহ, বাছাই ও সনাক্ত করাবেন। কোনগুলো উপকারী ও কোনগুলো ক্ষতিকর পোকা তা চেনাবেন এবং কেন সেগুলো উপকারী তা বলবেন। সহায়তাকারীর উচিত হবে তাঁদের আগ্রহকে কাজে লাগিয়ে যতটা পারা যায় তাঁদের ভূটা খেতে সরেজমিনে নিয়ে সেখান থেকে পোকা সংগ্রহ করে সেগুলো তাঁদের চেনানো।

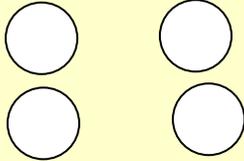
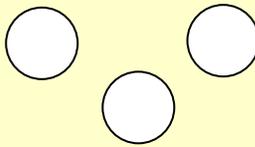
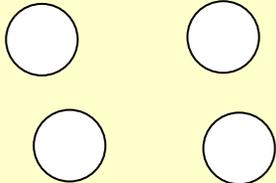
পাঠ সহায়িকা

ভূমিকা

পিএফএস-এ এটি একটি আনন্দদায়ক ও উপভোগ্য সেশন। কৃষকদের এ বিষয়ে বেশ আগ্রহ থাকে, ভূটা খেতের পোকামাকড় তাঁরা চিনতে চান। কোন পোকা ক্ষতি করে, কোন পোকা করে না সেসব কথাও জানতে চান। তাই

শত্রু ও বন্ধু পোকা

দলভিত্তিক হাত জাল বা হাত দিয়ে সংগৃহীত পোকা সমূহ পলিব্যাগে সংগ্রহ করার পরে ইথাইল এসিটেট দিয়ে অবশ্য করে সাদা বড় কাগজে নিম্নরূপভাবে বাছাই ও সনাক্তকরণ করবেন-

অপকারী পোকা	নিরপেক্ষ/ অজানা পোকা	উপকারী পোকা
		

ভূটার গুরুত্বপূর্ণ উপকারী ও অপকারী পোকা

উপকারী পোকা: লেডি বার্ড বিটল, ক্যারাবিড বিটল, স্ট্যাফাইলিনিড বিটল, ইয়ার উইগ, কোটেসিয়া বোলতা, বোলতা, পরভোজী কাঁটা গান্ধি পোকা ইত্যাদি।



অপকারী পোকা: মাজরা পোকা, আসিয়ান মাজরা পোকা, লেদা পোকা, জাব পোকা, থ্রিপস, কাটুই পোকা, সাদা গ্রাব, ফল আর্মি ওয়ার্ম, মোচা ছিদ্রকারী পোকা ইত্যাদি।



ভূট্টার রোগের লক্ষণ বা নমুনা সংগ্রহ, বাছাই ও সনাক্তকরণ

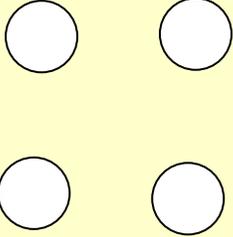
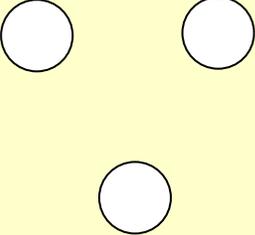
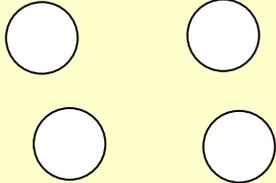
সহায়তাকারীর জন্য সেশন পরিচালনার নির্দেশনা

পিএফএস-এ একটি আনন্দদায়ক ও উপভোগ্য সেশন হলো রোগ চেনা। কৃষকদের এ বিষয়ে বেশ আগ্রহ থাকে। ভূট্টা খেতের পোকামাকড় যেমন তাঁরা চিনতে চান, রোগও চিনতে চান। কোন রোগ কোথায় কখন হয়, তার লক্ষণ কিরূপ, কিভাবে তা নিয়ন্ত্রণ করা যায় এসব কথাও জানতে চান। তাই সহায়তাকারীর উচিত হবে তাঁদের এই আগ্রহকে কাজে লাগিয়ে যতটা পারা যায় তাঁদের ভূট্টা খেতে উপস্থিত রোগগুলো চিনিয়ে দেয়া ও সে সম্পর্কে আলোচনা করা। সহায়তাকারী মাঠে ভূট্টার রোগের নমুনা সংগ্রহের জন্য ৫টি দলকে নিয়ে যাবেন ও হাতে যেগুলোকে রোগ বলে মনে হয় তার নমুনা সংগ্রহ করাবেন। রোগের নমুনা সংগ্রহ করে কৃষকদের দিয়ে সেগুলো বাছাই করানোর পর কোনটি কি রোগ তা চিনতে সাহায্য করবেন। প্রয়োজনে বিভিন্ন রোগের ছবির সহায়তা নেবেন। কোন রোগ ভূট্টাগাছের কোন অংশ থেকে সংগ্রহ করেছেন তা জানতে চাইবেন।

পাঠ সহায়িকা

রোগ সনাক্তকরণ

দলভিত্তিক ধান খেত থেকে বিভিন্ন রোগের নমুনা সংগ্রহ করার পর সাদা বড় কাগজে নিম্নরূপভাবে বাছাই করে তার নিচে রোগগুলোর নাম লিখে সনাক্তকরণ করবেন-

পাতার রোগ	খেলের রোগ	দানার ও শীষের রোগ
		



সহায়তাকারীর জন্য সেশন পরিচালনার নির্দেশনা

ভূট্টার গুরুত্বপূর্ণ রোগগুলোর পরিবেশসম্মত সমন্বিত ব্যবস্থাপনার সাধারণ কৌশলসমূহ সহায়তাকারী আলোচনা করবেন। এক্ষেত্রে কোন রোগের ব্যবস্থাপনায় কৃষকদের কি কি অভিজ্ঞতা রয়েছে তা বিনিময় করবেন। আলোচনার সময় যতগুলো রোগের নমুনা প্রশিক্ষণার্থীদের দেখানো যায় তা দেখাবেন।

পাঠ সহায়িকা

ভূমিকা

অন্যান্য ফসলের মত ভূট্টাগাছে বেশ কিছু রোগের আক্রমণ দেখা যায়। সঠিক সময়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করলে রোগের আক্রমণ থেকে ফসলহানি হ্রাস করা সম্ভব।

ভূট্টার পাতা ঝলসানো রোগ

এ রোগ হলে প্রথমে গাছের নিচের দিকে পাতায় লম্বাটে ধূসর বর্ণের দাগ দেখা যায়। পরবর্তীকালে গাছের উপরের অংশে তা ছড়িয়ে পড়ে। রোগের আক্রমণ বেশি হলে পাতা শুকিয়ে যায় এবং গাছ মরে যায়। রোগের জীবাণু মাটিতে দীর্ঘদিন বেঁচে থাকতে পারে এবং বাতাসের সাহায্যে আক্রান্ত গাছ থেকে অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। বাতাসের আর্দ্রতা বেশি হলে এই রোগের আক্রমণ বেড়ে যায়। এই রোগ দমনের জন্য আক্রান্ত ফসলে টিল্ট ২৫০ ইসি (০.০৫%) ১৫ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে এবং ফসল সংগ্রহের পর জমি থেকে আক্রান্ত গাছ সরিয়ে বা পুড়িয়ে ফেলতে হবে।



কাণ্ড পচা রোগ

এ রোগের প্রাথমিক লক্ষণ হলো কাণ্ড পচে যাওয়া ও পচার কারণে গাছ মাটিতে ভেঙ্গে পড়ে। আমাদের দেশে খরিফ মৌসুমে এ রোগটি বেশি দেখা যায়। জমিতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ বেশি এবং পটাশের পরিমাণ কম হলে ছত্রাকজনিত কাণ্ড পচা রোগ বেশি হয়। এ রোগটি ভূট্টার ধ্বংসাত্মক রোগ যার আক্রমণে শতভাগ ফলন নষ্ট হতে পারে। এটি মাটি, বীজ ও বায়ুবাহিত রোগ। বাংলাদেশের খরিফ মৌসুমে চাষ করা ভূট্টায় সাম্প্রতিক সময়ে এই রোগের ব্যাপক লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। এ রোগ হলে আক্রান্ত গাছের পাতা বিবর্ণ হয়ে যায়, গাছ শুকিয়ে ধূসর বর্ণ ধারণ করে এবং অপরিপক্ব অবস্থায় মারা যায়। এ রোগের ফলে শিকড়, গোড়া ও দুই গিঁটের মাঝের অংশগুলো পচে যায়। আক্রান্ত গাছের কাণ্ড চিরলে সেখানে বিবর্ণতা দেখা যায় এবং পিথ নষ্ট হয়ে যায়। আক্রান্ত গাছের কাণ্ডে চাপ দিলে নরম মনে হয় এবং নিচের পর্বমধ্যগুলো অতি সহজেই ভেঙ্গে যায়। আক্রান্ত গাছের মোচাগুলো হলে পড়ে এবং দানা অপুষ্ট থাকে।



এ রোগ দমনের জন্য উপযুক্ত ছত্রাকনাশক (কার্বাক্সিন+থিরাম) দ্বারা বীজ শোধন করে চাষাবাদ করতে হবে। সুষম মাত্রায় সার প্রয়োগ বিশেষ করে নাইট্রোজেন ও পটাশের ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। আক্রান্ত জমির ফসল সংগ্রহের পর অবশিষ্টাংশ পুড়িয়ে ফেলতে হবে এবং শস্য পর্যায় অনুসরণ করতে হবে। রোগ দমনের জন্য কার্বেনডাজিম গ্রুপের ছত্রাকনাশক যেমন অটোস্টিন ৫০ ডব্লিউডিজি অনুমোদিত মাত্রায় প্রথমবার গাছের আট পাতা অবস্থায় (হাঁটু সমান উচ্চতায়) এবং দ্বিতীয়বার সিল্ক বের হওয়ার পর (মোচায় ফুল আসার পর) স্প্রে করতে হবে। এছাড়াও প্রিপিকোনাজল/টেবুকোনাজল/ (এজক্সিস্ট্রোবিন+ডাইফেনোকোনাজল) গ্রুপের ছত্রাকনাশক অনুমোদিত মাত্রায় ১০-১২ দিন অন্তর ২ বার পাতায় স্প্রে করতে হবে।

ভূট্টার বীজ পচা ও চারা ঝলসানো রোগ

বীজ পচা এবং চারা ঝলসানো রোগে চারা নষ্ট হওয়ার কারণে ক্ষেতে ভূট্টা গাছের সংখ্যা কমে যায়। জমিতে রসের পরিমাণ বেশি হলে এ রোগ বেড়ে যায়। এসব রোগ নিয়ন্ত্রণ করতে হলে সুস্থ, সবল ও ক্ষতমুক্ত বীজ, পচা রোগ প্রতিরোধী জাত ব্যবহার করতে হবে। জমি বেশি ভেজা থাকলে বীজ লাগানো যাবে না। বীজ বোনার আগে ছত্রাকনাশক দিয়ে বীজ শোধন করে নিতে হবে।

ভূট্টার মোচা ও দানা পচা রোগ

মোচা ও দানা পচা রোগ ভূট্টার ফলন, বীজের গুণাগুণ ও খাদ্যমান কমিয়ে দেয়। এ রোগে আক্রান্ত মোচার খোসা ও দানা বিবর্ণ হয়ে যায়। দানা পুষ্ট হয় না কুঁচকে অথবা ফেটে যায়। অনেক সময় মোচাতে বিভিন্ন দানার মাঝে বা উপরে ছত্রাক জীবাণুর উপস্থিতি খালি চোখে দেখা যায়। ভূট্টা গাছে মোচা আসা থেকে পাকা পর্যন্ত বৃষ্টি বেশি থাকলে এ রোগের আক্রমণ বাড়ে। একই জমিতে বার বার ভূট্টার চাষ করলে এ রোগ দ্রুত বিস্তার লাভ করে। তাই এ রোগের প্রাদুর্ভাব কমাতে একই জমিতে বার বার ভূট্টা চাষ করা উচিত নয়। এ ছাড়া জমিতে পাখি ও পোকাকার আক্রমণ রোধ করতে হবে, ভূট্টা পেকে গেলে তাড়াতাড়ি কেটে ফেলতে হবে এবং কাটার পর ভূট্টার পরিত্যক্ত অংশ পুড়িয়ে ফেলতে হবে।



ভূট্টার ঝুল রোগ

এটি একটি ছত্রাকজনিত রোগ। মাটির উপরে থাকা ভূট্টাগাছের যে কোনো অংশ এ রোগ দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। সাধারণত এ রোগ আক্রমণস্থলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। এ রোগে আক্রান্ত অংশে কালো ভূষা বা ঝুলকালির মতো লক্ষণ দেখা যায়। আক্রমণের প্রথম দিকে আক্রান্ত স্থানে প্রথমে আঁচিল বা ক্ষুদ্র গুটির মতো লক্ষণ দেখা দেয়, পরে সেগুলো কালচে হয়ে গাঢ় রঙের ছত্রাকের স্পোর চড়িয়ে পড়ে। খরিপ মৌসুমে বা গরম পড়লে এ রোগ বেশি হয়। এ রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য কোনো রাসায়নিক ছত্রাকনাশক নেই। আক্রান্ত অংশ সংগ্রহ করে ধ্বংস করা উত্তম ব্যবস্থা।



সহায়তাকারীর জন্য সেশন পরিচালনার নির্দেশনা

সহায়তাকারী কৃষকদের দলগতভাবে ভূট্টা খেতের বর্তমান অবস্থা পর্যবেক্ষণ, জরিপ ও সঠিক ব্যবস্থাপনার সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ যেন তাঁরা নিজেরাই নিতে পারেন সে কৌশল/ পদ্ধতি বুঝিয়ে বলবেন, আয়েসার মাধ্যমে অনুশীলন করাবেন। এ অধিবেশনে সহায়তাকারী এমনভাবে আলোচনা করবেন ও দেখাবেন যেন তাঁরা ভূট্টা খেতের কৃষি পরিবেশ ও পরিবেশ কি তা বুঝতে পারেন, পরিবেশের যেসব উপাদান তাঁরা দেখলেন সেগুলোর মধ্যে কি সম্পর্ক রয়েছে তাঁরা সহজে বুঝতে পারেন। এসব পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে তাঁরা কিভাবে ফসল ব্যবস্থাপনার সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন সেই প্রক্রিয়া হাতে কলমে করে বুঝিয়ে দেবেন।

পাঠ সহায়িকা

ভূমিকা

ভূট্টা খেতের কৃষি পরিবেশ বিশ্লেষণ (আয়েসা) করে তার আলোকে গৃহীত সিদ্ধান্ত গ্রহণপূর্বক ভূট্টা ফসলের ব্যবস্থাপনা করলে ফসল ভালো হয়। পার্টনার ফিল্ড স্কুলে এই চর্চা কৃষককে জমি ও ফসলের অবস্থা নিবিড়ভাবে দেখা ও বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা সৃষ্টি করে। কৃষক এর মাধ্যমে নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারেন। এজন্যই আয়েসাকে কৃষক মাঠ স্কুলের হার্ট বলা হয়।

পরিবেশ কি?

আমাদের চারপাশের জীব ও জড়সহ যা কিছু আছে সেগুলো নিয়েই আমাদের পরিবেশ।

কৃষি পরিবেশ কি?

ফসলের সাথে পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান যেমন, মাটি, পানি, আবহাওয়া, আগাছা, পোকামাকড়, রোগ, পানি, তাপমাত্রা, আলো ইত্যাদির যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও নির্ভরশীলতা তাই হল কৃষি পরিবেশ।

কৃষি পরিবেশ বিশ্লেষণ (AES: Agro-Eco System Analysis)

কৃষি পরিবেশ বিশ্লেষণ বা আয়েসা হল কৃষির সাথে সম্পর্কযুক্ত সকল জৈবিক উপাদান যেমন, ফসল, আগাছা, উপকারী পোকা, মাকড়সা, ক্ষতিকর পোকা, মাকড়, অনুজীব ইত্যাদি ও অজৈবিক উপাদান যেমন, মাটি, পানি, বাতাস, সার, আলো, তাপমাত্রা, আর্দ্রতা ইত্যাদি শনাক্ত করা, তাদের বর্তমান অবস্থা জানা এবং ফসলের ওপর তাদের পারস্পরিক প্রভাব বিশ্লেষণ করে ফসলের জন্য করণীয় বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

পিএফএস-এ আয়েসা অনুশীলনের ধাপসমূহ

- প্রথমে ৫টি দল থেকে এক জন করে নিয়ে অতিরিক্ত আরেকটি দল গঠন করতে হবে যারা কৃষক প্লটের তথ্য সংগ্রহ করবেন। সংগৃহীত তথ্যসমূহ একটি সাদা কাগজে লিখে বোর্ডে লাগিয়ে রাখতে হবে যাতে অন্যান্য দল আইসিএম প্লটের তথ্য উপস্থাপনার সময় তুলনার জন্য এটি ব্যবহার করতে পারেন। কৃষক প্লটের জন্য আয়েসা অংকন করার দরকার নেই।
- একইসাথে মূল ৫ টি দল ভূট্টার আইসিএম প্লটে আয়েসা তথ্য সংগ্রহ ও প্লট পর্যবেক্ষণ করবেন। সকল তথ্য ও পর্যবেক্ষণ অংকন ও বিশ্লেষণ শেষে উপস্থাপিত হবে।
- উপস্থাপন চলাকালীন সহায়তাকারী প্রতিটি দলের উপস্থাপিত তথ্য বা প্রতিটি বিষয়ের গড় ফলাফল (৫ দলের) কৃষক প্লটের সাথে তুলনা করার জন্য ও রেকর্ড রাখার জন্য একীভূত করবেন।
- উপস্থাপন শেষে সহায়তাকারী সকল সিদ্ধান্ত বা মতামতের ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করবেন।
- আয়েসার সিদ্ধান্তসমূহ ও উল্লেখযোগ্য তথ্য এফএফএস রেজিস্টারে আইসিএম প্লটের পর্যবেক্ষণ অংশে লিপিবদ্ধ করবেন।

(আয়েসার ছক)

-----পার্টনার ফিল্ড স্কুল

দল:

ফসল বিন্যাস:

জমির ধরন:

মাটির ধরন:

রোপণ তারিখ

রোপণোত্তর দিবস:

তারিখ:

ফসল: ভূট্টা

জাত:

গড় পাতার সংখ্যা:

গড় উচ্চতা:

গড় মোচার সংখ্যা:

শত্রু পোকা	ফসল	বধু পোকা
মোট=		মোট=

পর্যবেক্ষণের বিষয়	পর্যবেক্ষণ	সিদ্ধান্ত
১. আবহাওয়া		
২. মাটির রস		
৩. আগাছা		
৪. সারের অভাবজনিত লক্ষণ		
৫. রোগ (কম/মধ্যম/বেশি)		
৬. ফসলের সার্বিক অবস্থা		

সহায়তাকারীর জন্য সেশন পরিচালনার নির্দেশনা

সহায়তাকারী কৃষকরা ভূট্টা খেতে উপকারী জীবের বংশবৃদ্ধি ও লালনপালনের যেসব পদ্ধতি অনুসরণ ও বাস্তবায়ন সহজে করতে পারে, সেগুলো নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করবেন।

পাঠ সহায়িকা

ভূমিকা

ধান ফসলে অসংখ্য উপকারী ও ক্ষতিকর পোকা রয়েছে। এদের বেশিরভাগই উপকারী পোকা। কৃষক পোকা দেখামাত্রই কীটনাশক ঔষধ প্রয়োগ করে এর কারণ উপকারী পোকাকার জগত সম্পর্কে তাঁদের ধারণা কম। উপকারী পোকা কিভাবে উপকার করে তা যদি কৃষক জানতে পারেন সে অনুযায়ী ব্যবস্থাপনা সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন। এতে ফসল ব্যবস্থাপনা খরচ সাশ্রয় হবে ও পরিবেশ ভালো থাকবে। ভূট্টার জমিতে উপকারী ও ক্ষতিকর পোকাসমূহ পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। একটির সংখ্যা বাড়লে অন্যটি কমে যায়, একটি কমলে অন্যটি বেড়ে যায়। এভাবে প্রকৃতিতে ৯০ ভাগের উপরে ক্ষতিকর পোকাকে উপকারী পোকা খেয়ে আমাদের ফসলকে রক্ষা করছে। তাই এসব উপকারী পোকা সম্পর্কে কৃষকদের জানা ও সেগুলো ধান খেতে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা উচিত।

ভূট্টা খেতের উপকারী জীব

ভূট্টা খেতে শুধু উপকারী পোকা ও মাকড়সা না, অনেক জীবও আছে যারা ফসলের ক্ষতিকর পোকাকে ধ্বংস করে। যেমন ফিঙে পাখি, ব্যাঙ, পঁচা ইত্যাদি। এসব উপকারী জীব হলো কৃষকের বন্ধু জীব। ভূট্টা খেতে সাধারণত দুই ধরনের বন্ধু জীব দেখা যায়-

(ক) পরভোজী বন্ধু জীব: যে সকল পোকামাকড় বা জীব অন্য পোকাকে ধরে, আক্রমণ করে বা শিকার করে খেয়ে জীবন ধারণ করে এদের পরভোজী পোকা বলে। যেমন- মাকড়সা, লেডিবিটল, ক্যারাবিড বিটল, ব্যাঙ, ফিঙে পাখি, শালিক পাখি ইত্যাদি। এসব পরভোজী উপকারী জীবের বৈশিষ্ট্য হলো একটি পরভোজী জীব বিভিন্ন প্রজাতির অনেকগুলো ক্ষতিকর পোকা খায়, এরা শিকারকে খেয়ে তার রস চুষে তাৎক্ষণিকভাবে মেরে ফেলে, পরভোজী পোকাদের বাচ্চা ও পূর্ণবয়স্ক উভয়ই ক্ষতিকর পোকাকে শিকার করে। কোন উপকারী পোকা কোন ক্ষতিকর পোকাকে শিকার করে তা নিচের তালিকায় দেয়া হলো-



উপকারী জীবের নাম	শিকারের নাম
মাকড়সা	সকল প্রকার মথ
ক্যারাবিড বিটল	ভূট্টার মাজরা পোকাকার ছোট কীড়া
লেডিবার্ড বিটল	ভূট্টার জাব পোকাকার বাচ্চা ও পূর্ণাঙ্গ পোকা, অন্যান্য পোকাকার ডিম ও ছোট কীড়া
ইয়ার উইগ	মাজরা পোকাকার কীড়া
ড্রাগন ফ্লাই	ভূট্টার মাজরা পোকাকার মথ
ড্যামসেল ফ্লাই	ভূট্টার মাজরা পোকাকার মথ
এসাসিন বাগ ও রিডুভিড বাগ	মাজরার ডিম ও ছোট কীড়া

উপকারী জীবের নাম	শিকারের নাম
পরভোজী কাঁটা গান্ধি	ভূট্টার মাজরা পোকাকার ছোট বাচ্চা
ফিঙে পাখি	সকল মথ, লেদা পোকা
ছত্রাক জীবাণু (মেটারিজিয়াম)	ফল আর্মি ওয়ার্মের কীড়া
ভাইরাস জীবাণু (এনপিভি)	ফল আর্মি ওয়ার্মের কীড়া

(খ) পরজীবি বন্ধু জীব: যে সব পোকা অন্য পোকাকার দেহের উপর বা ভিতরে তার জীবনের একটি অংশ কাটায় এবং ঐ পোকাকে মেরে ফেলে, এদের পরজীবি পোকা বলে। সাধারণত একটি পরজীবি পোকা তার জীবনকাল সম্পন্ন করার জন্য একটি মাত্র পোষক পোকাকার প্রয়োজন হয়। সাধারণ পরজীবি যেমন মানুষের মাথার উঁকুন, পেটের কৃমি পোষককে মারে না কিন্তু পোকাকার পরজীবি পোষককে মেরে ফেলে। যেমন-বোলতা ও মাছি। এরা ক্ষতিকর পোকাকার ডিম, কীড়া, পুত্তলী, পূর্ণাঙ্গ পোকাকার দেহে পরজীবিতা দ্বারা মেরে ফেলে। এদের বংশবৃদ্ধির ক্ষমতা বেশি ও দ্রুত গতিসম্পন্ন। ভূট্টা খেতে বহু রকমের বোলতা পরজীবী বন্ধু হিসেবে বিভিন্ন কীড়াকে মেরে ফেলে। যেমন কোটেসিয়া বোলতা মাজরা, মোচা ছিদ্রকারী পোকা ও ফল আর্মি ওয়ার্ম লেদা পোকাকার বাচ্চাদের পরজীবিতা দ্বারা মেরে ফেলে।



ভূট্টা খেতে উপকারী জীব সংরক্ষণের উপায়

- ভূট্টা খেতে উপকারী জীব সংরক্ষণের সবচেয়ে ভালো উপায় হলো খেতে কোনো রাসায়নিক কীটনাশক প্রয়োগ না করা।
- খেতে উপকারী জীবদের খাদ্য এবং থাকা বা আশ্রয়ের ব্যবস্থা করতে পারলে তারা সেখান থেকে সহজে অন্য খেতে যায় না।
- খেতের মধ্যে কঞ্চি বা ডাল পুঁতে দিলে তাতে বিভিন্ন পোকা খেকো পাখিরা বসার আশ্রয় পায়, খড়ের বল বানিয়ে কাঠির মাথায় মশালের মতো বেঁধে খেতের মধ্যে স্থাপন করলে তা মাকড়সাদের আশ্রয়স্থল হিসেবে কাজ করে।
- ভূট্টা খেতের আইলে শিম বা ফুলজাতীয় সবজি চাষ করলে সেসব ফুলের মধু খেতে অনেক বোলতারা আসে। ফলে ওদের খাদ্য ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা হয়। এতে ভূট্টা খেতে সেসব জীবের বংশবৃদ্ধি হয় ও সংখ্যা বাড়ে।
- অনেক সময় খেতের মধ্যে রোগগ্রস্ত মরা কীড়া বা লেদা পোকা দেখা যায়। এগুলো সংগ্রহ করে পানিতে শরবতের মতো গুলে খেতে স্প্রে করলে সেসব রোগাক্রান্ত কীড়ার উপকারী রোগজীবাণু খেতে ছড়িয়ে পড়ে ও জীবিত কীড়াদের মেরে ফেলে।
- পরজীবিতার দ্বারা যদি মরা কোনো ডিমের গাদা, পুত্তলি বা কীড়া দেখা যায় তাহলে সেগুলো সংগ্রহ করে পলিব্যাগের মধ্যে লালন করলে দু চার দিনের মধ্যেই তা থেকে বোলতা বেরিয়ে আসে। পলিব্যাগের মুখ খুলে খেতে ছেড়ে দিলে সেখানে ওদের সংখ্যা বেড়ে যায়। ভূট্টা খেতে বাঁশের চোঙে পরজীবিতায় আক্রান্ত কীড়া ও ডিমের গাদা রেখে সেখান থেকে পরজীবি বোলতা জন্মাতে পারলে সেগুলো বাঁশের চোঙ থেকে খেতে বেরিয়ে এসে সংখ্যা বাড়াতে পারে।
- বাণিজ্যিকভাবে বর্তমানে কিছু উপকারী জীব (পোকা) ও জীবাণু ল্যাবরেটরিতে উৎপাদন করে তা বিক্রি করা হচ্ছে। নিউক্লিয়ার পলিহেড্রোসিস ভাইরাস (এনপিভি) ও ট্রাইকোথামা বোলতা এর মধ্যে অন্যতম। বাজার থেকে কিনে এগুলো ভূট্টা খেতে ব্যবহার করা যায়।
- মোদা কথা হলো ভূট্টা খেতে উপকারী জীবের সংখ্যা যত বাড়বে, ক্ষতিকর পোকা তত কমবে।

সহায়তাকারীর জন্য সেশন পরিচালনার নির্দেশনা

এটি একটি সচেতনতা সৃষ্টির সেশন। এই সেশনে সহায়তাকারী অংশগ্রহণকারী কৃষক-কিষাণীদের নিরাপদ খাদ্য ও পুষ্টি সম্পর্কে ধারণা দেবেন। বিশেষ করে তারা এ সেশন শেষে যেন বুঝতে পারেন, নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য কি, কিভাবে রোজ আমাদের খাদ্য অনিরাপদ হচ্ছে, খাদ্যকে নিরাপদ রাখতে আমাদের কি করা উচিত ও কি করা উচিত না ইত্যাদি। এ বিষয়ে অংশগ্রহণমূলক আলোচনার মাধ্যমে সহায়তাকারী কৃষক-কিষাণীদের কাছে জানতে চাইবেন, আমরা রোজ যেসব খাদ্য খাই তা খেয়ে কি আমাদের কোনো অসুবিধা বা সমস্যা হয়? আমরা কি যা খাই তা আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য নিরাপদ মনে করি? সচরাচর নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাবার গ্রহণে আমরা যেসব সাধারণ ভুলগুলো করি সহায়তাকারী তা তুলে ধরবেন এবং কি করা উচিত ও কি করা উচিত না তা বঝিয়ে বলবেন।

পাঠ সহায়িকা

ভূমিকা

সুস্থভাবে বাঁচতে না পারলে জগতের কিছুই ভালো লাগে না, অশান্তিতে জীবনটা বিধিয়ে ওঠে। আমাদের অধিকাংশ খাদ্য অনিরাপদ যা খেলে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হচ্ছে। আমাদের সনাতন খাদ্যাভ্যাস ও বিশৃঙ্খল জীবন যাপন রোগ ও দুর্ভোগ ডেকে আনছে। তাই সুস্থ থাকার জন্য আমাদের অবশ্যই নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন ও গ্রহণ করা উচিত। তবে খাদ্য শুধু নিরাপদ হলেই হবে না, তা হতে হবে পুষ্টিকরও। তাহলেই আমরা সুস্থ-সবল থাকব।

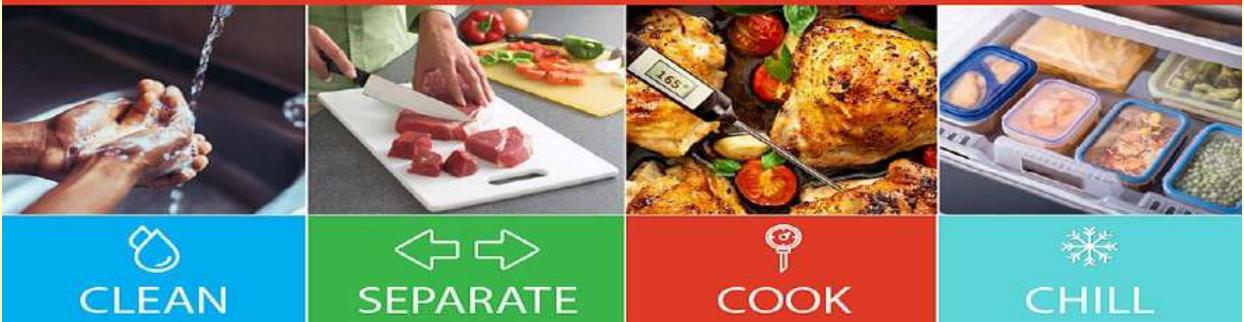
নিরাপদ খাদ্য (Safe food)

এক কথায় নিরাপদ খাদ্য হলো সেই খাদ্য যা খেলে আমাদের কোনো স্বাস্থ্য ঝুঁকি থাকে না বা যে খাদ্য স্বাস্থ্যের জন্য নিরাপদ। নিরাপদ খাদ্য হলো সেই খাদ্য যা সঠিক নিয়মে, পরিষ্কার ও নিরাপদভাবে সংগ্রহ, পুষ্টিমান অক্ষুণ্ণ রেখে প্রক্রিয়াজাত, সংরক্ষণ করা হয় এবং খাদ্যে রোগজীবাণুর উপস্থিতির ঝুঁকি থাকে না বা কম থাকে। উৎপাদন থেকে শুরু করে খাওয়া পর্যন্ত প্রত্যেক ধাপে খাদ্য নিরাপদ ও পরিষ্কার রাখা উচিত। নিরাপদ খাবার খাওয়া এবং সুস্থ থাকার জন্য নিচের কতিপয় অনুসরণীয় স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা দরকার।

খাদ্য নিরাপদতা (Food safety)

খাদ্য নিরাপদতা হল এক বা একাধিক পদক্ষেপ যা ভোক্তার স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য খাদ্যকে খাদ্যের বিভিন্ন বিপত্তি থেকে রক্ষা করে। খাদ্যকে দূষিত করতে পারে তথা মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক খাদ্যস্থিত যে কোন কিছুকে খাদ্যবিপত্তি বলা হয়। খাদ্য সংশ্লিষ্ট বিপত্তি নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে খাদ্য ব্যবসার সাথে জড়িত খাদ্যকর্মীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ দূষিত খাবার খেয়ে রোগাক্রান্ত হচ্ছে এবং যাদের অনেকেই গুরুতর অসুস্থ হচ্ছে। কেউ কেউ আবার সারা জীবনের জন্য রোগাক্রান্ত হচ্ছে এবং বংশ পরম্পরায় আক্রান্ত হচ্ছে। খাদ্যবাহিত রোগে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হচ্ছে শিশু, বয়স্ক ব্যক্তি, গর্ভবতী মহিলা এবং যারা আগে থেকেই অন্য কোন কারণে অসুস্থ।

4 STEPS TO FOOD SAFETY

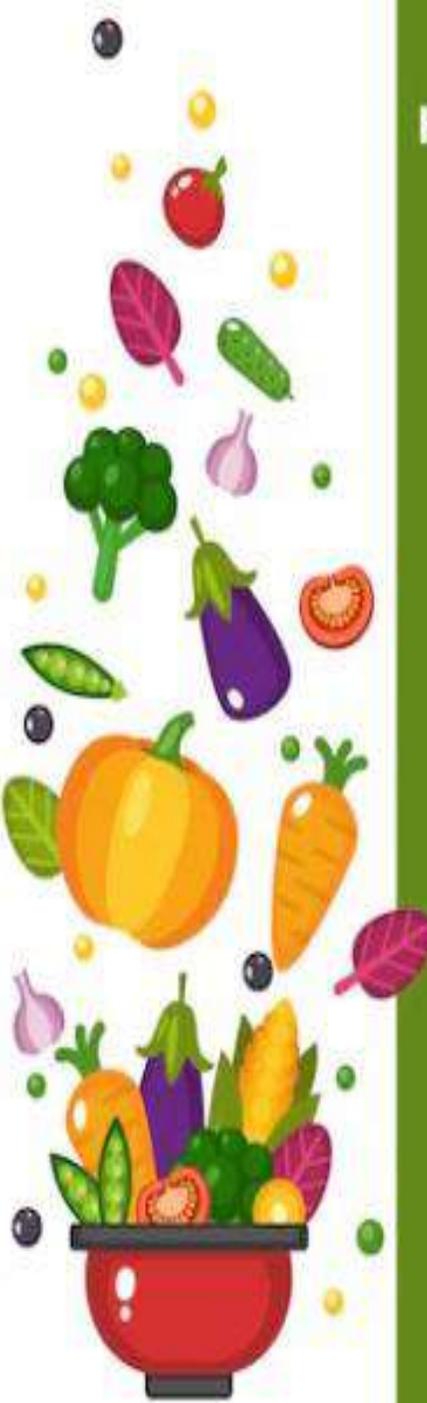




নিরাপদ খাদ্যে সুস্থ জীবন



নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য



খাদ্য নিরাপদ রাখার উপায়

- খাদ্য গ্রহণের পূর্বে সঠিক পদ্ধতিতে হাত ধুয়ে নিতে হবে;
- খাদ্য গ্রহণ করতে হবে নিয়মিত ও পরিমিত।
- খাদ্য হতে হবে নিরাপদ, পরিচ্ছন্ন ও ভালভাবে রান্না করা।
- কাঁচা দুধ বা কাঁচা ডিম খাওয়া নিরাপদ নয়, কারণ তাতে রোগজীবাণু থাকে;
- রান্না করা খাবার ২ ঘন্টার বেশি রেখে দেয়া হলে খাবার আগে ভালভাবে গরম করে নিতে হবে।
- খাদ্য গ্রহণ করতে হবে সঠিক পরিমাণে;
- বাসি-পচা, ছত্রাক বা ফাঙ্গাস পড়া বা দুর্গন্ধযুক্ত খাবার খাওয়া যাবে না। তা খেলে পেটের অসুখ দেখা দিতে পারে।
- মাছি পরা খাবার খেলে ডায়রিয়া, আমাশয়, কলেরা, টাইফয়েড ইত্যাদি রোগ হতে পারে; তাই খাবার সব সময় ঢেকে রাখতে হবে;
- বিভিন্ন খাবার বা মিষ্টি জাতীয় খাবারে রং মেশানো যাবে না। বিভিন্ন খাবারে যে সব রং ব্যবহার করা হয়, সেগুলো যদি রাসায়নিক বা কাপড়ের রং হয় তাহলে ক্যান্সার ও কিডনী রোগ দেখা দিতে পারে। এমনকি কৃত্রিম রং ব্যবহৃত খাদ্য বাজার থেকে কিনে খাওয়া উচিত হবে না;
- টমেটো, মটরগুঁটি, পাকা কলা, মাছ ও বিভিন্ন খাদ্যকে সতেজ বা পাকা করার জন্য যেসব রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা হয় (যেমন: কার্বাইড ও ফরমালিন) তা থেকে ক্যান্সারসহ বহুরকম রোগ হতে পারে। তাই স্বাভাবিক পদ্ধতিতে প্রাকৃতিক উপায়ে পাকানো ফল খাওয়া উচিত;
- বাজার থেকে কেনা শাকসবজি ও ফলে অনেক সময় বালাইনাশকের দূষণ থাকে। তাই সেগুলো খাওয়ার আগে কিছুক্ষণ পানিতে ভিজিয়ে রেখে ভালোভাবে ধুয়ে খাওয়া উচিত;
- বিভিন্নবস্তু দ্বারা খাদ্য দূষণ হয়, যেমন- চুল, ভাঙা কাঁচ, ধুলাবালি, আবর্জনা, তেলাপোকা, ইত্যাদি। খাদ্য যাতে দূষিত না হয় সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে ও দূষিত খাদ্য খাওয়া যাবে না;
- বিশেষ বিশেষ খাদ্যের প্রতি কারো কারো অ্যালার্জি থাকে। যেমন- চীনাবাদাম, তিলবীজ, চিংড়ি, কাঁকড়া, বেগুন ইত্যাদি। যে খাদ্যের প্রতি অ্যালার্জি থাকে তা খাওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।

ভূট্টার পুষ্টিমূল্য ও স্বাস্থ্যগত উপকারিতা

- ভূট্টায় ৭০-৮৭ % কার্বোহাইড্রেট, ৬-১৩ % প্রোটিন, ৪% ফ্যাট, ২-৬ % তেল ও ১-৩% চিনি থাকে।
- ভূট্টা একটি শক্তিদায়ক পুষ্টিকর খাদ্য। প্রতি ১০০ গ্রাম ভূট্টা থেকে ৩৬৫ কিলো ক্যালরি শক্তি পাওয়া যায়।
- হলুদ রঙের ভূট্টায় প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন-এ (ক্যারোটিন) থাকে যা দৃষ্টিশক্তি ভালো রাখে, বেগুনি ও লাল রঙের ভূট্টায় থাকে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যা ক্যান্সার প্রতিরোধে সাহায্য করে।
- ভূট্টা একটি আঁশসমৃদ্ধ খাদ্য যা কোষ্ঠকাঠিন্য কমায় ও দেহ থেকে দূষিত/ বিষাক্ত দ্রব্য বেরিয়ে যেতে সাহায্য করে।
- যাদের ভাত বা গমের আটা খেলে সমস্যা হয়, তাদের ভূট্টা খেলে সে সমস্যা হয় না।



PARTNER



সহায়তাকারীর জন্য সেশন পরিচালনার নির্দেশনা

অংশগ্রহণকারীরা একটি ত্রিপলের উপর ইংরেজী ইউ অক্ষর করে বসবেন। সহায়তাকারী কুশল বিনিময় করে সেশন সূত্রপাত করবেন এবং সেশনের উদ্দেশ্য সুস্পষ্টভাবে বলবেন। ভূমিকায় ফার্মাস্ সার্ভিস সেন্টার সম্পর্কে বলবেন। সকলের সাথে আলোচনার মাধ্যমে মাসিক চাঁদার পরিমাণ নির্ধারণ করবেন এবং এই সঞ্চয় কিভাবে ব্যবহার হতে পারে তা নিয়ে সদস্যদের মতামত শুনবেন। কিভাবে ফার্মাস্ সার্ভিস সেন্টারের জন্য ব্যাংক একাউন্ট খুলতে ও পরিচালনা করতে হবে সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবেন। সেন্টারের আয়-ব্যয় এর হিসাব রক্ষণ বিষয়ে আলোচনা করবেন। সার্ভিস সেন্টারের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন রেজিস্টার যেমন চাঁদা আদায় রেজিস্টার, সভার কার্যবিবরণী রেজিস্টার, বাৎসরিক পরিকল্পনা রেজিস্টার, আয়-ব্যয় রেজিস্টার ইত্যাদি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা দেবেন। অন্যান্য কার্যক্রম সম্পর্কেও আলোচনা করবেন।

পাঠ সহায়িকা

ভূমিকা

ফার্মাস্ সার্ভিস সেন্টার (এফএসসি) হচ্ছে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তালিকাভুক্ত এমন একটি কৃষক গ্রুপ যারা আগ্রহী কৃষকদেরকে ফসল উৎপাদন প্রযুক্তি, কৃষি উপকরণ সংগ্রহ, কৃষি যন্ত্র ব্যবহার এবং বিক্রয় সম্পর্কিত সেবা নির্দিষ্ট সার্ভিস চার্জের বিনিময়ে প্রদান করবেন ও উদ্যোক্তা হিসেবে কৃষি ব্যবসায় পরিচালনা করবেন। সাধারণত যেখানে যেখানে যে ফসল ক্লাস্টার বা গুচ্ছাকারে উৎপাদিত হয় সেখানে সেই ফসলটির জন্য ফার্মাস্ সার্ভিস সেন্টার স্থাপিত ও উদ্যোক্তা তৈরি হবে। এ উদ্দেশ্যে প্রাথমিক অবস্থায় পার্টনার প্রোগ্রামের মাধ্যমে পার্টনার ফিল্ড স্কুল (পিএফএস) পরিচালিত হচ্ছে। পার্টনারের প্রত্যাশা, ফিল্ড স্কুল সমাপ্ত হওয়ার পর সেগুলো ফার্মাস্ সার্ভিস সেন্টারে রূপান্তরিত হবে। এই সেন্টারের কার্যনির্বাহী কমিটি হবে ৯ (নয়) সদস্য বিশিষ্ট। পিএফএস সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে পিএফএস-এর সদস্যরা আলোচনা বা সরাসরি ভোটাভুটির মাধ্যমে ফার্মাস্ সার্ভিস সেন্টারের কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করবেন। কমিটিতে অবশ্যই দুইজন নারী সদস্য অন্তর্ভুক্ত থাকবেন। কার্যনির্বাহী কমিটির প্রকৃতি হবে অরাজনৈতিক। এই কমিটিতে একজন করে চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, সেক্রেটারি, ক্যাশিয়ার ও পাঁচ জন সদস্য থাকবেন। সদস্যদের মধ্যে অন্তত ২ জন নারী সদস্য থাকবেন। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের স্থানীয় উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা ফার্মাস্ সার্ভিস সেন্টারের গঠনে সাহায্য করবেন, কার্যক্রম তদারক করবেন ও সভায় উপস্থিত থাকবেন।

মাসিক সভা

কার্যনির্বাহী কমিটির সভা প্রতি মাসে একটি করে অনুষ্ঠিত হবে। প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে একটি দিন বা বার নির্দিষ্ট করা থাকলে সদস্যদেরও তা মনে রাখতে সুবিধা হয়। তবে বিশেষ পরিস্থিতিতে চেয়ারম্যান ও সেক্রেটারি যে কোন সময় সভা আহ্বান করতে পারবেন। প্রতি ৬ বা ১২ মাসে সকল সদস্যদের উপস্থিতিতে একটি করে সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। কার্যনির্বাহী কমিটি ও সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের জন্য ন্যূনতম ৭০% উপস্থিতি প্রয়োজন।

মাসিক সঞ্চয়

ফার্মাস্ সার্ভিস সেন্টারের আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নে ও সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালনায় অর্থের প্রয়োজন। সেজন্য সদস্যরা একটি নির্দিষ্ট হারে মাসিক সঞ্চয় করবেন। মাসিক সভার দিন তাঁরা এই সঞ্চয়ের টাকা ক্যাশিয়ারের কাছে প্রদান করবেন। ক্যাশিয়ার তা সঞ্চয় রেজিস্টারে লিখে রাখবেন ও ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা দেবেন। সদস্যরা চাইলে একটি সঞ্চয় পাশ বই তৈরি করে সেখানেও নিয়মিত সঞ্চয়ের টাকা লিখে রাখতে পারেন। এটি ভবিষ্যতে হিসাব সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনে সাহায্য করতে পারে।

ব্যাংক হিসাব

ফার্মার্স সার্ভিস সেন্টারের সদস্যদের মাসিক চাঁদা, আয়, অনুদান, সহায়তা ইত্যাদি থেকে প্রাপ্ত অর্থ কারো হাতে নগদ না রেখে অবশ্যই তা একটি ব্যাংক হিসাবে জমা রাখা উত্তম। সেজন্য পিএফএস চলাকালীন সময়ের মধ্যে ফার্মার্স সার্ভিস সেন্টারের নামে যে কোনো তদিশীলী ব্যাংকে একটি হিসাব খুলতে হবে। এ সময়ে সহায়তাকারী ও উপজেলা কৃষি অফিস সহায়তা করতে পারবেন। তবে ব্যাংক হিসাব খোলার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র যেমন গঠনতন্ত্র, প্রথম সভার কার্যবিবরণী, হিসাব পরিচালনাকারীদের জাতীয় পরিচয় পত্র, ছবি ইত্যাদি প্রস্তুত রাখতে হবে। চেয়ারম্যান, সেক্রেটারি এবং কোষাধ্যক্ষ- এই তিন জনের যে কোন দুই জনের যৌথ স্বাক্ষরে ফার্মার্স সার্ভিস সেন্টার অথবা পার্টনার ফিল্ড স্কুলের নামে একটি ব্যাংক হিসাব পরিচালিত হবে। প্রতি বছরের শুরু সাধারণ সভায় বিগত বছরের আয়-ব্যয়, ব্যাংক হিসাব সহ যাবতীয় আর্থিক তথ্য সাধারণ সদস্যদের সামনে কোষাধ্যক্ষ উপস্থাপন করবেন। একই সভায় সমিতির অতীত কর্মকাণ্ড এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও বিনিয়োগ সম্পর্কিত বিষয়াদি তুলে ধরবেন সেক্রেটারী। সেন্টারের আয়-ব্যয়ের অবস্থা বিবেচনা করে সাধারণ সদস্যদের কোন লভ্যাংশ কত দেওয়া প্রাপ্য হবেন তা পূর্বেই ক্যাশিয়ার হিসাব কণ্ডে রাখবেন। তিনি কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় তা উপস্থাপন করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাবেন এবং লাভ-লোকসানের বিষয়টি চেয়ারম্যান সভাকে অবহিত করবেন। সাধারণ সভায় সাধারণ সদস্যরা ফসল উৎপাদন, আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডসহ সার্বিক যে কোন বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করতে পারবেন।

অন্যান্য কার্যক্রম

- কার্যনির্বাহী কমিটি নিয়মিত মিটিং করতে সচেষ্ট থাকবেন। আয়বর্ধনমূলক কাজের পাশাপাশি সদস্যদের ভেতর আন্তঃসম্পর্ক উন্নয়ন করার জন্য কার্যনির্বাহী কমিটি পহেলা বৈশাখ সহ বিভিন্ন দিবসে স্বল্প পরিসরে বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ড, বৃক্ষরোপণ, খেলাধুলা সহ এলাকা উপযোগী অনুষ্ঠান আয়োজন করবেন।
- ফার্মার্স সার্ভিস সেন্টারের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ রাখবেন। কমিটির চেয়ারম্যান সকল স্টেকহোল্ডারদের সাথে সমন্বয় করবেন এবং গ্রুপকে মবিলাইজ করা সহ গ্রুপের যাবতীয় কাজে নেতৃত্ব প্রদান করবেন।
- কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তার মাধ্যমে ফসল উৎপাদনের প্রযুক্তি ও ঝুঁকি ফার্মার্স সার্ভিস সেন্টারে যুক্ত কৃষকদেরকে নিয়মিত অবহিত করবেন। প্রতিটি উৎপাদন মৌসুমের শুরুতেই উপজেলা কৃষি অফিস ফার্মার্স সার্ভিস সেন্টারের মাধ্যমে বাজারের চাহিদা ভিত্তিক টেকসই ফসল উৎপাদন পরিকল্পনা গ্রহণ করবেন। গৃহীত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য উপকরণ বিক্রেতা, কৃষি যন্ত্র বিক্রেতা এবং ফসলের ক্রেতাদের সাথে ফার্মার্স সার্ভিস সেন্টারের যোগাযোগের বিষয়টি উপজেলা কৃষি অফিস সমন্বয় করবে।
- ফার্মার্স সার্ভিস সেন্টার প্রয়োজন মনে করলে ফসল উৎপাদনের আগে এবং মৌসুম চলাকালীন সময়ে কৃষকদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। কৃষি রপ্তানিকারকদেরকে ফার্মার্স সার্ভিস সেন্টারের মাধ্যমে চাষাবাদ করতে উপজেলা কৃষি অফিস উৎসাহিত করবে।
- ব্লকের উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা সাচিবিক দায়িত্ব পালনে কিভাবে সভার কার্যবিবরণী, চিঠি লিখতে এবং কাগজপত্র সংরক্ষণ করতে হয় সে বিষয়ে সেক্রেটারিকে ধারণা প্রদান করবেন।
- ফার্মার্স সেন্টার ভাড়া প্রদান ও সদস্যদের ব্যবহারের জন্য কোন যন্ত্র ক্রয় করলে তা নির্দিষ্ট কোন সদস্য বা সাধারণ সদস্যের আওতায় রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। সেন্টারের প্রাথমিক সদস্যদের ক্ষেত্রে যন্ত্র ব্যবহারে ভাড়া আদায় করতে হবে তবে তার পরিমাণ উপকারভোগী কৃষকের চেয়ে কম হবে।
- সেন্টারের কৃষকদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ফার্মার্স সেন্টার নিজ ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার/ বিশেষজ্ঞকে আমন্ত্রণ জানিয়ে কৃষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারেন। পাশাপাশি উপজেলা কৃষি অফিস সহ বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি সংস্থায় আয়োজিত উপযোগী প্রশিক্ষণে যেন তারা অংশগ্রহণের সুযোগ পান সে বিষয়ে উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা প্রয়োজনীয় সমন্বয় করবেন।

ফার্মার্স সার্ভিস সেন্টার কি? এ থেকে কিভাবে কৃষকরা সহায়তা পেতে পারে এবং পিএফএস কৃষকদের সেবা ও আয়বর্ধনমূলক কাজ কি কি হতে পারে

সহায়তাকারীর জন্য সেশন পরিচালনার নির্দেশনা

পিএফএস কৃষকরা কিভাবে তাদের গ্রুপকে কৃষক সেবা কেন্দ্রে রূপান্তরিত করতে পারে, তার মাধ্যমে তারা কিভাবে লাভবান/ উপকৃত হতে পারে, নানারকম সেবা ও আয়বর্ধনমূলক কাজে কিভাবে জড়িত হতে পারেন ও পিএফএস কমিটি তাতে কিভাবে সহায়তা করতে পারে সে সম্পর্কে সহায়তাকারী আলোচনা করবেন। আলোচনা শুরু আগের আগে তাঁরা যাতে একত্রিত ও সংগঠিত হয়ে একটি সংগঠনে রূপান্তরিত হতে পারে সেজন্য তাঁদের ‘এক বৃদ্ধ ও তাঁর চার বাগড়াটে পুত্র’ নাটিকার মাধ্যমে তাঁদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এ নাটিকার মাধ্যমে সহায়তাকারী একতাই শক্তি বার্তাটি তুলে ধরবেন। এরপর তাঁদের সাথে অংশগ্রহণমূলক আলোচনার মাধ্যমে তাঁদের কাছ থেকে কথা বের করে আনবেন যে তাঁরা কি করবেন, কিভাবে করবেন, করলে কি লাভ হবে ইত্যাদি।

পাঠ সহায়িকা

ভূমিকা

পার্টনারের প্রত্যাশা প্রতিটি পিএফএস একটি ফার্মার্স সার্ভিস সেন্টারে রূপান্তরিত হবে। কৃষক গ্রুপের টেকসই উন্নয়নের জন্যই তা দরকার। এরূপ সেন্টারে প্রশিক্ষিত কৃষকরা একদিকে যেমন নিজেরা নিজেদের টেকসই উন্নতির জন্য নানামুখী কর্মকাণ্ড পরিচালিত করতে পারবে, পাশাপাশি পড়শি কৃষকদেরও নানারকম কৃষি সেবা প্রদান করে সেই সমাজের উপকার করতে পারবে। নিজেদের অতিরিক্ত আয়ের জন্য প্রতিটি ফার্মার্স সার্ভিস সেন্টারকে চাইলে তারা একটি গ্রোথ সেন্টারে পরিণত করতে পারেন যেখানে তাঁদের নিরাপদ ফসল ও ফসলজাত পণ্য বিশ্বস্ততার সাথে বিপণন করে পারিবারিক আয় বাড়াতে পারেন। এমনকি এর মাধ্যমে যুব ও নারী উদ্যোক্তাও সৃষ্টি হতে পারে। অগ্রহী হলে তাঁদের মাধ্যমে পার্টনারের বিভিন্ন উপকরণ ও যন্ত্র সেবা কার্যক্রমও পরিচালিত হতে পারে। দলগতভাবে তাঁরা কৃষি যন্ত্র সংগ্রহ করে তা সমবায়ভিত্তিতে ব্যবহার করে খামারকাজে লাভবান হতে পারেন। এসব কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের জন্য তাঁদের মধ্য থেকে নেতৃত্বের বিকাশলাভ ঘটবে ও তাঁরা সমাজে আরও বেশি মর্যাদার অধিকারী হবেন।

ফার্মার্স সার্ভিস সেন্টার

প্রাথমিকভাবে ফার্মার্স সার্ভিস সেন্টার হবে পিএফএস কৃষক-কিষাণীদের দ্বারা গঠিত একটি অনানুষ্ঠানিক সংগঠন যা তাদের গোষ্ঠীস্বার্থে কাজ করবে। সাধারণত পিএফএস প্রশিক্ষণ শেষ হলে সে দলের সাথে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সংযোগ কমে যায় বা থাকে না। কিন্তু পিএফএস প্রশিক্ষণ চলাকালে যদি তাঁরা সংগঠিত হতে পারে ও নিজেদের পিএফএসকে একটি ফার্মার্স সার্ভিস সেন্টারে রূপান্তরিত করতে পারে তাহলে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সাথে তাঁদের যোগাযোগে স্থায়ী হবে ও অধিকতর সেবা লাভের সুযোগ সৃষ্টি হবে। ভবিষ্যতে এর মাধ্যমে সমন্বিত সম্প্রসারণ সেবা নিশ্চিত হবে।

ফার্মার্স সার্ভিস সেন্টারের উদ্দেশ্য

- সকল ধরনের কৃষি প্রযুক্তি বিস্তারের প্ল্যাটফর্ম হিসেবে ব্যবহার করে পড়শি কৃষকদের মাঝে সেসব প্রযুক্তির সম্প্রসারণ ঘটানো
- উচ্চমূল্যের পুষ্টিকর ফসল চাষে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করা
- লাভজনকভাবে পণ্য বাজারজাতকরণের জন্য একটি লাগসই ভ্যালু চেইন ও বাজার সংযোগ তৈরি করা। ফার্মার্স সার্ভিস সেন্টার গ্রুপের কৃষকরা যাতে যৌথ চাষাবাদ ও পণ্য একত্রীকরণের মাধ্যমে যৌথ বিপণনের দ্বারা লাভবান হতে পারেন সে ব্যাপারে তাঁদের পরামর্শ সেবা প্রদান ও সহযোগিতা করা
- প্রশিক্ষিত পিএফএস কৃষকদের সংগঠনে রূপান্তরিত করে কৃষকদের ক্ষমতায়ন করা

- সরকারি ও বেসরকারি সমন্বিত কৃষি সম্প্রসারণ সেবা প্রদান করা ও সেবাদানকারী সংস্থা বা ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ সৃষ্টি করা
- কৃষি উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ী তৈরি করা
- সদস্যদের আয়, সাংগঠনিক দক্ষতা ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি করা।

ফার্মার্স সার্ভিস সেন্টার পরিচালনার নীতিমালা

- ১। প্রতিটি ফার্মার্স সার্ভিস সেন্টার একটি ৯ সদস্য বিশিষ্ট কার্যনির্বাহী কমিটির দ্বারা পরিচালিত হবে।
- ২। এ সংগঠনের একটি সংক্ষিপ্ত ও সহজ গঠনতন্ত্র থাকবে।
- ৩। সদস্যরা নিয়মিত সঞ্চয় করবেন ও তা ব্যাংক একাউন্টে জমা রাখা হবে। প্রয়োজন সভায় আলোচনার মাধ্যমে সদস্যদের সঞ্চয় ও বিনিয়োগ করা যাবে।
- ৪। মাসে একটি সভা করতে হবে। প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে (৫ তারিখের মধ্যে সুবিধাজনক কোনো বার ও সময়ে) সভার একটি দিন স্থির করে সভা আহ্বান করা যেতে পারে। অবশ্যই সংশ্লিষ্ট ব্লকের উপ সহকারী কৃষি অফিসারের উপস্থিতিতে সভা আয়োজন করতে হবে। সভার কার্য বিবরণী লিখে রাখতে হবে।
- ৫। উপজেলা কৃষি অফিসার/ অতিরিক্ত কৃষি অফিসার / কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার ফার্মার্স সার্ভিস সেন্টারের কার্যক্রম পরিদর্শন ও মনিটরিং করবেন।
- ৬। ফার্মার্স সার্ভিস সেন্টারের একটি বাৎসরিক কর্ম পরিকল্পনা থাকবে।
- ৭। সংগঠন চাইলে সমবায় অধিদপ্তরে যাবতীয় নিয়ম কানুন মেনে নিবন্ধন করতে পারে।

ফার্মার্স সার্ভিস সেন্টারের বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা (বছর -----)

কার্যক্রম	উদ্দেশ্য/ কারণ কি? (পরিবেশ উন্নয়ন/ সামাজিক সুরক্ষা সেবা/ উদ্যোক্তা ও কৃষি ব্যবসা/ আয়বৃদ্ধি ইত্যাদি)	পরিমাণ (কতটুকু/ কয়টি করা হবে?)	বাজেট (টাকা)	কখন করা হবে? (মাস ও বছর)	কোথায় করা হবে? (স্থান)	কে বা কারা করবেন? (কার্যক্রম বাস্তবায়নকারীবৃন্দ)

একজন কৃষক ফার্মার্স সার্ভিস সেন্টার থেকে যে সকল সহায়তা পেতে পারেন

- বীজ সংগ্রহ
- বালাইনাশক প্রয়োগ
- সমবায় ভিত্তিতে আবাদ
- সার্ভিস চার্জের বিনিময়ে কৃষি যন্ত্র ব্যবহার
- উৎপাদিত শস্য বিক্রয়

ফার্মার্স সার্ভিস সেন্টারের এর আয় বর্ধনমূলক কিছু কাজ

- সার্ভিস চার্জের ভিত্তিতে বীজ, সার, বালাইনাশক সরবরাহ
- কৃষি যন্ত্র ভাড়া প্রদান
- সার্ভিস চার্জের ভিত্তিতে দক্ষ কৃষি শ্রমিক সরবরাহ
- সার্ভিস চার্জের ভিত্তিতে উৎপাদিত ফসল পরিবহন ও বিক্রয়
- কৃষাণীদের মাধ্যমে খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ

সহায়তাকারীর জন্য সেশন পরিচালনার নির্দেশনা

সহায়তাকারী অংশগ্রহণমূলক আলোচনা ও পদ্ধতিগুলো অনুশীলনের মাধ্যমে অধিবেশন পরিচালনা করতে পারেন। স্থানীয়ভাবে যেসব জৈব বালাইনাশক পাওয়া যায় ও তৈরি করা যায় তার কিছু নমুনা প্রদর্শন করবেন ও কৃষকদের দিয়ে ১ বা ২টি জৈব বালাইনাশক প্রস্তুত করাবেন। বাজারে যেসব জৈব বালাইনাশক পাওয়া যায় তার কিছু জৈব বালাইনাশক যা ভূট্টা ফসলে ব্যবহারের জন্য অনুমোদিত সে সম্পর্কে নমুনা প্রদর্শনসহ পরিচিত করাবেন।

পাঠ সহায়িকা

ভূমিকা

রাসায়নিক বালাইনাশক ব্যবহারে পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের ক্ষতি হচ্ছে। তাই বিশ্বব্যাপী এখন জৈব বালাইনাশকের ব্যবহার বাড়ছে, বিশেষ করে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনে। দুই ধরনের জৈব বালাইনাশক রয়েছে। কারখানায় প্রস্তুত কৃত্রিম জৈব বালাইনাশক ও ঘেও প্রস্তুত ভেষজ বালাইনাশক। এ দেশে বর্তমানে ৭৭টি জৈব বালাইনাশক বাজারজাতকরণে সরকার অনুমোদন দিয়েছে। কিন্তু ঘরোয়া পদ্ধতিতে প্রস্তুত করা যায় এরূপ জৈব বালাইনাশকের কোন অনুমোদন নেই। তবে এরূপ জৈব বালাইনাশক পরিবেশবান্ধব ও নিরাপদ, সস্তা ও সহজে ব্যবহার করা যায় বিধায় পিএফএস-এর কৃষক-কিষাণীরা এসব জৈব বালাইনাশক তৈরি করে ব্যবহার করতে পারেন। তা না পারলে বাজার থেকে জৈব বালাইনাশক কিনে তা প্রয়োগ করতে পারেন।

জৈব বালাইনাশকের সুফল

- জৈব বালাইনাশক পরিবেশের কোন ক্ষতি করে না।
- জৈব বালাইনাশক প্রভাবে ক্ষতিকর পোকাকার বৃদ্ধি ব্যাহত হলেও উপকারী পোকামাকড়ের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া নেই।
- মাটির অণুজীব ও কেঁচোর ওপর কোন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই।
- জমিতে স্প্রে করার সাথে সাথে ফসল তোলা ও ব্যবহার করা যায়।
- জৈব বালাইনাশকের কোন দীর্ঘ মেয়াদী অবশিষ্টাংশ বিদ্যমান থাকে না বলে পরিবেশের জন্য নিরাপদ।

ভেষজ বালাইনাশক

জৈব উৎস বিশেষ করে উদ্ভিদ/উদ্ভিদাংশ থেকে উৎপন্ন বালাইনাশক ভেষজ জৈব বালাইনাশক বলে। আমাদের দেশ আয়তনে ছোট হলেও উদ্ভিদ বৈচিত্র্যে খুবই সমৃদ্ধ। আবহমান কাল থেকেই মানুষের স্বাস্থ্য সেবায় গাছ গাছালি ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এমনকি কৃষি ফসল উৎপাদনের ও সংরক্ষণেও গাছ গাছড়ার ব্যবহার ঐতিহ্য সুদীর্ঘ কালের।

কিছু ভেষজ বালাইনাশক তৈরি ও ব্যবহারের পদ্ধতি

১. নিমের পাতা, ছাল ও কাপড় কাচা সাবান দ্বারা: দুই কেজি নিমের পাতা, ১.৫ কেজি নিমের ছাল শিল পাটায় একটু খেতলে নিন। খেতলানো পাতা, ছাল এবং ৫০ গ্রাম গুড়া সাবান একটি পাত্রে দিয়ে ৫ লিটার পানি মিশ্রিত করুন। জ্বাল দিয়ে ৫ লিটার পানিকে কমিয়ে ১ লিটার বানিয়ে ঠান্ডা করে ছেকে নিন। ৯ লিটার পানি যোগ করে স্প্রে করুন। এতে সকল প্রকার মাছি পোকা, বিটল জাতীয় পোকা, কীড়া ও বিছা পোকা দমন করা যায়।
২. নিম পাতার গুড়া দ্বারা: নিম পাতা ছায়ায় বিছিয়ে এক সপ্তাহ শুকাতে হবে। শুকনা পাতা ভাল করে গুড়া করতে হবে। প্রতি ৫০ কেজি বীজ সংরক্ষণের জন্য ১ কেজি গুড়া মিশাতে হবে। সংরক্ষণের মেয়াদ বাড়তে হলে সমপরিমাণ ধুতরা পাতার গুড়া একই রকম মিশাতে হবে। এতে গুদামজাত ফসলের পোকা দমন হয়।

৩. নিম বীজ দ্বারা: এক কেজি নিম বীজ ছায়ায় শুকিয়ে খোসা ছাড়িয়ে নিন। বীজ পিসে মলমের মত তৈরী করুন। এর সাথে ৭৫ গ্রাম গুড়া সাবান মিশান। মিশ্রণটি ১০০ লিটার পানি মিশালে ২% দ্রবণ তৈরী হবে। দ্রবণ এক রাত রেখে দিন। এরপর ৭০-৮০ সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় ২/৩ ঘন্টা ফুটিয়ে ঠান্ডা করে ছেকে জমিতে ব্যবহার করুন। এতে পাতা মোড়ানো পোকাসহ বিভিন্ন ধরনের কীড়া ও গান্ধি পোকা দমন করা যায়। এটা কুমিনাশকের কাজ করে।
৪. মেহগনি বীজ: ৮-১০ টি কাচা ফলের সাদা অংশ কুচি কুচি করে কেটে ৭ দিন ভিজিয়ে রেখে ছেকে ৫০ গ্রাম কাপড় পরিষ্কার করা পাউডার মিশিয়ে স্প্রে করুন। বাদামী গাছ ফড়িং, মাজরা, পাতা মোড়ানো ও ডায়মন্ড ব্যাক মথ দমন করা যায়।
৫. তামাক পাতা দ্বারা: এক কেজি কাচা তামাক পাতা ১০ লিটার পানিতে সারা রাত ভিজিয়ে রেখে কচলিয়ে নিন। ছেকে ব্যবহার করুন অথবা বড় আকারের ১০টি শুকনা পাতা ১০ লিটার পানিতে সারা রাত ভিজিয়ে ছেকে ব্যবহার করুন। মাইট ও জ্যাসিড দমন করা যায়।
৬. বিষকাটালী ও ঢোল কলমী দ্বারা: বিষকাটালী বা ঢোল কলমীর পাতা, কাভ (পেশানো) ১ কেজি, ১০ লিটার পানিতে ভিজিয়ে ঢেকে স্প্রে করুন। এতে জাবপোকা, মাছি, পাতা ও ফলখেকো কীড়া দমন করা যায়।
৭. টমেটো গাছ দ্বারা: এক কেজি কাভ ও পাতা ৫ লিটার পানিতে মিশিয়ে ১৫-২০ মিনিট জ্বাল দিন। ছেকে নিয়ে স্প্রে করুন। এতে কাভ পাতার শোষক পোকা লার্ভা দমন হয়।
৮. কালো কচুর পাতা দ্বারা: এক কেজি কালো কচুর পাতা ৫ লিটার পানিতে মিশিয়ে ৩০ মিনিট সিদ্ধ করুন। ঠান্ডা করে ছেকে ব্যবহার করুন। এতে কীড়া, বাদামী গাছ ফড়িং, পাতা শোষক পোকা দমন হয়।
৯. আতা ও শরিফার পাতা দ্বারা: এক কেজি পাতা পিষানো (বাটা) ১০ লিটার পানিতে গুলিয়ে ছেকে স্প্রে করুন। এতে কুমড়ার পোকা, ডায়মন্ড ব্যাক মথা, জাব পোকা, জ্যাসিড দমন করা যায়।
১০. শুকনা মরিচের গুড়া দ্বারা: ১০০ গ্রাম শুকনা মরিচের গুড়া ১ লিটার পানিতে মিশিয়ে ভিজিয়ে রাখুন। এক ৫০ গ্রাম গুড়া সাবান মিশিয়ে ৫ লিটার পানি যোগ করুন এবং ছেকে স্প্রে করুন। এতে মোজেইক ভাইরাস রোগের বাহক, পিঁপড়া, জাব পোকা দমন হয়।
১১. পাট বীজের দ্বারা: এক কেজি বীজ আস্তে আস্তে কড়াইতে ভেজে নিন। ভাজা বীজ পিষে নিন এবং ৬০ লিটার পানিতে ভিজিয়ে রাখুন। ছেকে নিয়ে ১ বিঘা জমিতে স্প্রে করুন। এতে মাজরা, গান্ধি, পাতা শোষক পোকা দমন করা যায়।
১২. পিয়াজ: ২০ মিলিলিটার রস ২ লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন। এতে ঢলে পড়া রোগ দমন হয়।
১৩. নিশিন্দা পাতা: দুই কেজি নিশিন্দা পাতা, ১০৫ কেজি নিশিন্দার ছাল শিল পাটায় একটু খেতলে নিন। খেতলানো পাতা, ছার এবং ৫০ গ্রাম গুড়া সাবান একটি পাত্রে দিয়ে ৫ লিটার পানি মিশ্রিত করুন। জ্বাল দিয়ে ৫ লিটার পানিতে কমিয়ে ১ লিটার বানিয়ে ঠান্ডা করে ছেকে নিন। ৯ লিটার পানি যোগ করে স্প্রে করুন। এতে সকল প্রকার পাতা খেকো, বিছা ও সেমিলুপার দমন হয়।
১৪. ইপিল ইপিল পাতা ও জবা ফুলের রস: ১ কেজি ইপিল ইপিল পাতা ও ১ কেজি জবা ফুলের পাতা বেটে ১০ লিটার পানিতে গুলিয়ে নির্ধাস তৈরী করে স্প্রে করতে হবে।
১৫. পেঁপে পাতার নির্ধাস: ১ কেজি পেঁপে পাতা কুচি কুচি করে কেটে ১ লিটার পানিতে মিশিয়ে ভালভাবে ঝাঁকিয়ে নিতে হবে এবং এক রাত রেখে তাতে ১০ লিটার পানি যোগ করে ছেকে নিতে হবে এবং স্প্রে করতে হবে। এতে পাউডারি মিলডিউ রোগ নিরাময় হয়।

ভূট্টার জন্য জৈব বালাইনাশক

১. ফাউলিজেন (এসএফএনপিভি): ভূট্টার ফল আর্মি ওয়ার্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতি বিঘায় ৪৫ লিটার পানির সাথে ১৫ মিলিলিটার ফাউলিজেন জৈব বালাইনাশক মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।
২. ফল আর্মিওয়ার্ম ফেরোমোন লিউর (এবামেকটিন): ভূট্টার ফল আর্মি ওয়ার্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতি হেক্টরে ৪০টি লিউর বা ফেরোমোন ফাঁদ দিতে হবে।
৩. হে-লিউর আর্মিওয়ার্ম: ভূট্টার ফল আর্মি ওয়ার্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতি হেক্টরে ৪০টি লিউর বা ফেরোমোন ফাঁদ দিতে হবে।
৪. ফল আর্মিলিউর: ভূট্টার ফল আর্মি ওয়ার্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতি হেক্টরে ৪০টি লিউর বা ফেরোমোন ফাঁদ দিতে হবে।
৫. ট্রেসার ১৭৫এমএল (স্পাইনোসেড): প্রতি ১০ লিটার পানিতে ৪ মিলিলিটার ট্রেসার মিশিয়ে স্প্রে করে খ্রিপস ও জাব পোকা নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

সহায়তাকারীর জন্য সেশন পরিচালনার নির্দেশনা

সহায়তাকারী অংশগ্রহণমূলক আলোচনা ও পদ্ধতিগুলো অনুশীলনের মাধ্যমে অধিবেশন পরিচালনা করতে পারেন। এই সেশন শেষে ভূট্টা চাষিরা যেন ভালোভাবে বুঝতে পারেন, ভূট্টার পরিপক্বতার সূচক কি, কখন কিভাবে ভূট্টার মোচা সংগ্রহ করতে হবে, কিভাবে মাড়াই করতে ও শুকাতে হবে, কোথায কিভাবে মজুদ করতে হবে ইত্যাদি।

পাঠ সহায়িকা

ভূমিকা

মাঠে ভালোভাবে উৎপাদনের পরও অনেক সময় তা সঠিকভাবে সংগ্রহ না করার ও সংগ্রহের পরবর্তী কাজগুলো সঠিকভাবে না করার কারণে দানার মান কমে যায়। এমনকি ভালোভাবে দানা না মুকানোর ফলে তাতে সহজে পোকাকার আক্রমণ হয়। তাই ভূট্টা চাষিদের এসব বিষয়গুলো ভালোভাবে জেনে তা করা দরকার। বাজারজাতকরণ ও বীজ ভূট্টার জন্য বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ।

ভূট্টা সংগ্রহ

গাছ হলুদ হয়ে শুকিয়ে এলে ভূট্টার মোচা তোলা শুরু করা উচিত। ক্ষেতের ৭৫% গাছ এরূপ রং ধারণ করলে মোচা তোলা শুরু করা যেতে পারে। দেরিতে মোচা সংগ্রহ করলে পাখির উপদ্রব হতে পারে ও বৃষ্টি হলে দানার পচন শুরু হতে পারে। পরিপক্ব হলে মোচার খোসা শুকিয়ে যায় ও দানা শক্ত হয়ে যায়। মোচা হাতে নিয়ে খোসা ছাড়ানোর পর দানা খুলে দানার মুখে কালো দাগ দেখা গেলে বুঝতে হবে সে মোচা সংগ্রহের উপযুক্ত হয়েছে। শুষ্ক আবহাওয়ায় মোচা তুলতে হবে। যদি বৃষ্টি থাকে তাহলে কাণ্ডসহ মোচা বা গাছের আগা ভেঙ্গে গাছের সাথেই ঝুলিয়ে রেখে আসতে হবে। খেত থেকে মোচা তোলার পর বাড়িতে এনে সেসব মোচা ছায়া জায়গায় শুকনো চাটাইয়ের উপর বিছিয়ে রাখতে হবে।

মাড়াই

মোচা তোলার পর ধীরে ধীরে মোচার খোসা দুহাত দিয়ে টেনে ছাড়াতে হবে। খোসা ছাড়ানোর পর মোচাগুলোকে ৩-৪ দিন ভালভাবে রোদে শুকাতে হবে। শুকানোর পর হাতে বা মেশিনে মোচা থেকে দানা ছাড়াতে হবে। হাতে চালিত মাড়াই যন্ত্র দিয়ে বা ঝুড়িতে ঘষে ভূট্টার মোচা থেকে দানা আলাদা করা যায়। কিন্তু এতে সময় অনেক বেশি লাগে ও পরিমাণে বেশি হলে এভাবে মাড়াই করা কঠিন হয়।

শক্তিচালিত মেশিনে কম পরিশ্রমে ও কম সময়ে অধিক মোচা থেকে দানা মাড়াই করা যায়। বিএআরআই উদ্ভাবিত শক্তিচালিত ভূট্টা মাড়াই যন্ত্র দিয়ে প্রতি ঘন্টায় প্রায় ৩ টন ভূট্টা মাড়াই করা যায়। মাড়াই করার আগে মোচার খোসা ছাড়িয়ে ভাল করে শুকিয়ে নিতে হবে। মাড়াই শুরু করার আগে মোচাগুলো এক স্থানে গাদা করে রাখতে হবে। মেশিন চালু করার পর গাদা থেকে ঝুড়িতে মোচাগুলো ভরে ফিডিং হপারে ঢেলে দিয়ে পরিমাণ মতো মোচা হাত দিয়ে মাড়াই সিলিঙারে প্রবেশ করাতে হবে। মাড়াইকৃত দানা ট্রে দিয়ে নিচে জমা হবে। সেখান থেকে দানাগুলো সংগ্রহ করতে হবে।

শুকানো

সদ্য সংগৃহীত ভূট্টার দানায় ১৫-২৫% আর্দ্রতা থাকে। শুকিয়ে তা ১২-১৩% এ নামাতে হবে। এজন্য দানাগুলো রোদে শুকিয়ে কটকটে করতে হবে।

বীজ পরিষ্কার ও ঝাড়াই

মাড়াইয়ের পরের ধাপ হলো বীজ ঝাড়াই বা পরিষ্কার করা। ভালভাবে শুকানোর পর কুলা বা চালনি দ্বারা পরিষ্কার করতে হবে।

বীজ সংগ্রহ করার পর বীজের সাথে কিছু চিটা বীজ, আবর্জনা, খড়কুটো ইত্যাদি থাকে। ঝেড়ে এসব পরিষ্কার করা হয়। বীজ ঝাড়াইয়ের বেশ কিছু উপায় রয়েছে। যেমন কুলা বা প্রবল বাতাসে ঝাড়াই ও কলে ঝাড়াই। অনেক উন্নত দেশে নিউমেটিক সেপারেটর ও অ্যাসপিরেটর নামক বৈদ্যুতিক যন্ত্র দ্বারা বীজের আবর্জনা পরিষ্কার করা হয়।

গ্রেডিং

ভূট্টা বীজ পরিষ্কার করার পর সব বীজের আকার এক থাকে না। তাই আকার অনুসারে বীজকে আলাদা করা হয়। একে বলে বীজের গ্রেডিং বা ক্রমবিন্যাস। বিভিন্ন মাপের ছিদ্রযুক্ত চালুনি দ্বারা সহজেই চেলে বিভিন্ন আকারের বীজ আলাদা করা যায়।

বীজ মজুদ

বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণের শেষ ধাপ হলো বীজ সংরক্ষণ বা মজুদ। ভালোভাবে শুকানো বীজ সঠিক গুদাম ঘরে বা সঠিক স্থানে উপযুক্ত পাত্রে মজুদ করতে হয়। মজুদ ঘরের তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা বেশি থাকলে তাতে দ্রুত বীজের মান নষ্ট হয়ে যায়। টিনের উন্নতমানের পাত্রে, মাটির উন্নতমানের পাত্রে, পলিথিনসহ পাটের বস্তায় বীজ মজুদ করে গুদামে রাখা যায়। স্বল্পকালীন সময়ের জন্য ঠাণ্ডা, শুষ্ক ও বায়ু সঞ্চালিত কক্ষে বীজ সংরক্ষণ করা যায়। অত্যন্ত শুষ্ক বীজ বায়ুনিরোধক পাত্র যেমন পলিথিন বস্তা ও প্লাস্টিকের ড্রামে নিম্ন তাপমাত্রায় দীর্ঘকাল সংরক্ষণ করা যায়। সম্পূর্ণ শুষ্ক বীজ যার আর্দ্রতা ৯ থেকে ১৩ শতাংশের মধ্যে সেগুলো নিম্ন তাপমাত্রায় বায়ুহীন অবস্থায় বা বায়ুরোধী পাত্রে সংরক্ষণ করা উচিত। অধিক আর্দ্রতায়ুক্ত বীজে সহজে বিভিন্ন রোগজীবাণুর সংক্রমণ ঘটে। বীজে যাতে কোনো পোকামাকড় ও রোগজীবাণুর সংক্রমণ না হয় সেজন্য বীজের সাথে কীটনাশক ও ছত্রাকনাশক মিশিয়ে রাখা যায়। এ ছাড়া শুকনো নিম পাতার গুড়ো বীজের সাথে মিশিয়ে বীজ মজুদ করা যায়।



সহায়তাকারীর জন্য সেশন পরিচালনার নির্দেশনা

সহায়তাকারী অংশগ্রহণমূলক আলোচনার মাধ্যমে পার্টনার প্রবর্তিত ধানের ভ্যালু চেইন সম্পর্কে কৃষকদের ধারণা দেবেন ও তা ব্যবহার করে কৃষকরা কিভাবে লাভবান হতে পারেন সে সম্পর্কে আলোচনা করবেন।

পাঠ সহায়িকা

ভূমিকা

আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে পরিবেশসম্মতভাবে উন্নত মানের ভূট্টা বীজ উৎপাদন করতে পারলে পিএফএস তথা ফার্মাস সার্ভিস সেন্টারের সদস্য কৃষকরা তা বিপণনের মাধ্যমে অধিক লাভবান হতে পারবেন। সেজন্য একটি সুসংগঠিত বাজার সংযোগ তৈরি ও বিপণন কার্যক্রম সম্পর্কে কৃষকদের ভালো ধারণা থাকা দরকার। পার্টনার ফিল্ড স্কুলের প্রশিক্ষিত কৃষকরা হাইব্রিড ছাড়া অন্যান্য সর্বাধুনিক জাতের ভূট্টা উৎপাদন করবেন যেসব জাতের বীজ সাধারণত এলাকার কৃষকদের কাছে খুব সহজলভ্য না। তাই পিএফএস কৃষকরা তাঁদের নিজেদের জমিতে ভিত্তি বীজ বা প্রত্যয়িত বীজ সংগ্রহ করে আধুনিক বীজ উৎপাদন প্রযুক্তি অনুসরণ করে কৃষক পর্যায়ে বিশ্বস্ত ভূট্টা বীজ উৎপাদন ও বিপণন করতে পারেন। এতে স্থানীয়ভাবে ভূট্টা বীজ উৎপাদক গ্রুপ বা ব্যক্তি উদ্যোক্তা তৈরি হবে এবং আধুনিকতম জাতের ভূট্টা বীজ এলাকায় সহজলভ্য হবে।

ভূট্টা বীজ উৎপাদন, বাজার সংযোগ ও উদ্যোক্তা তৈরি

ব্যক্তি বা গ্রুপ উদ্যোক্তা হিসেবে ভূট্টা বীজ উৎপাদন ও বিপণনের জন্য যেসব কাজ করতে হবে সেগুলো হলো-

- উৎপাদন ও বিপণন সক্ষমতা বিবেচনা করে বীজ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ পূর্বক একটি উৎপাদন পরিকল্পনা করতে হবে।
- পরিকল্পনা ও চাহিদা অনুযায়ী বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির কাছ থেকে নির্বাচিত জাতের প্রয়োজনীয় পরিমাণ ভিত্তি বা প্রত্যয়িত বীজ সংগ্রহ করতে হবে।
- বীজ উৎপাদনের যাবতীয় প্রযুক্তি মেনে বীজ উৎপাদন করতে হবে। বিশেষভাবে গুরুত্ব দিতে হবে জাতের স্বাতন্ত্র্যিকরণ দূরত্ব ও বিজাত বাছাইয়ের ওপর।
- বীজ উৎপাদনের সময় স্থানীয় উপজেলা কৃষি অফিস বীজ ফসলের মাঠ পরিদর্শন করবেন ও পরামর্শ দেবেন।
- উৎপাদনের পর কৃষক বা কৃষকদের নিজেদের যতটুকু বীজ লাগে সেটুকু সঠিকভাবে মজুদ করবেন।
- অবশিষ্ট বীজ বিক্রির জন্য স্থানীয় পড়শি কৃষকদের চাহিদা নিয়ে তাঁদের কাছে উপযুক্ত মোড়কে বিক্রি করবেন। এরপরও অতিরিক্ত বীজ থাকলে তা স্থানীয় বীজ ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে সঠিক লেবেলিং তথা জাতের নাম, কৃষকের নাম ও মোবাইল নম্বর, উৎপাদনের তারিখ ইত্যাদি লিখে বিক্রির ব্যবস্থা করবেন। ফেসবুকে প্রচারের মাধ্যমে দূরবর্তী স্থানের কৃষকদের কাছে কুরিয়ারে/ অনলাইনে বীজ বিক্রি করা যেতে পারে। সবক্ষেত্রেই সততা ও বিশ্বস্ততা বজায় রাখতে হবে।
- গ্রুপের মাধ্যমেও এভাবে বীজের ব্যবসায় করা যায়। সেক্ষেত্রে দলগতভাবে পরিকল্পনা করে চাহিদা নিরূপণপূর্বক নির্দিষ্ট পরিমাণ জমি বর্গা নিয়ে বা গ্রুপের সদস্যদের জমিগুলোতে বীজ উৎপাদন করা যায়। উৎপাদিত বীজ গ্রুপের কোনো এক সদস্যের বাড়িতে একত্রীকরণের মাধ্যমে বা কালেকশন সেন্টারে যাবতীয় সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনার কাজ সম্পন্ন করার পর তা প্যাকেটজাত করে বিপণন করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে একজন সদস্য বিপণনকর্মী হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারেন। এতে গ্রুপের অন্যান্য সদস্যদের সময় ও শ্রম বাঁচবে, পরিবহন ব্যয়ও সাশ্রয় হবে এবং একজন সদস্যের কর্মসংস্থান হবে। এরূপ বিপণনের ক্ষেত্রে পূর্বেই বিভিন্ন বীজ ব্যবসায়ীদের সাথে দর কষাকষি করে মূল্য স্থির করার পর সেখানে বীজ নিয়ে যেতে হবে। এভাবে একটি গ্রুপ ভূট্টা বীজ উদ্যোক্তা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। পিএফএস বা ফার্মাস সার্ভিস সেন্টারের নামে সেসব বীজের ব্র্যান্ডিং হতে পারে। এতে ফার্মাস সার্ভিস সেন্টারের সেবা সহায়তাও সম্প্রসারিত হবে।

সহায়তাকারীর জন্য সেশন পরিচালনার নির্দেশনা

সহায়তাকারী খুব সংক্ষেপে প্রশিক্ষণার্থীদের ১৫ থেকে ৩০ মিনিটের মধ্যে পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আলোচনার মাধ্যমে ধারণা দেবেন যেন তাঁরা আলোচনা শেষে জানতে পারেন যে পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা কি, কেন তা জানা দরকার, পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষণার্থীদের পালনীয় কি। এ বিষয়ে পিএফএস কৃষক-কিষাণীদের সচেতন করতে হবে যেন তাঁরা তাঁদের প্রতিটি কর্মকাণ্ডে পরিবেশ সুরক্ষায় যত্নবান হয় ও সামাজিক সুরক্ষার বিষয়গুলো জেনে তা পালন করতে পারেন, একে অপরকে সম্মান করতে শেখেন।

পাঠ সহায়িকা

ভূমিকা

সারা বিশ্বে বর্তমানে পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষার বিষয়গুলো অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দেখা হচ্ছে। পার্টনার প্রোগ্রামেও এ বিষয়টিকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে প্রত্যেক স্টেকহোল্ডারদের এ বিষয়ে সচেতনতা ও করণীয় নির্ধারণের জন্য ইতোমধ্যে খসড়া ‘পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষা কাঠামো’ এবং ‘কর্পোরেট পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি’ প্রণয়ন করা হয়েছে যা কৃষি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। এ দুটি খসড়া ডকুমেন্টের ওপর ভিত্তি করে পার্টনার ও বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে বাস্তবায়িত পার্টনারের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে এ বিষয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করে প্রশিক্ষণার্থীদেরও এসব বিষয়ে সচেতন করা দরকার যাতে তারা তাদের স্ব স্ব অবস্থান থেকে বাংলাদেশের পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষায় ভূমিকা রাখতে পারে। যে কোন প্রশিক্ষণে এ বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে ১৫ থেকে ৩০ মিনিট এ বিষয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা কি?

আমাদের প্রতিদিনের কাজের ফলে পরিবেশের যে ক্ষতি হয় তা থেকে পরিবেশকে যথাযথভাবে রক্ষা করার জন্য যেসব কাজ করা হয় তাই পরিবেশ ব্যবস্থাপনা। যেমন- গোবর থেকে কম্পোস্ট সার তৈরি করা।

পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব

যে কোনো কাজেই পরিবেশের কিছু না কিছু ক্ষতি হয়ে থাকে। তাই এমনভাবে আমাদের কাজ করতে হবে যাতে আমাদের পরিবেশও ভালো থাকে আবার বর্তমান উন্নয়ন চাহিদা মিটিয়ে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যও প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়। আমরা যদি এখন সব সম্পদ ব্যবহার করে ফেলি তাহলে আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্ম তাদের চাহিদানুযায়ী প্রয়োজনীয় সম্পদ পাবে না। তাই তাদের ভালো রাখার জন্য হলেও পরিবেশকে রক্ষা করতে হবে।

সামাজিক ব্যবস্থাপনা কি?

সামাজিক জীব হিসেবে আমাদেরকে একটি নির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে বাস করতে হয়, যা নির্দিষ্ট সম্পদের সাথে সজ্জিত। সামাজিক ব্যবস্থাপনা হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যা সমাজের মানুষের আচার-আচরণ, কার্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ, বিশ্লেষণ করে এবং তার ক্রিয়াকলাপের নেতিবাচক সামাজিক প্রভাবগুলি হ্রাস করে। সামাজিক ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব আমাদের দৈনন্দিন কাজের ফলে সমাজে অনেক নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। যেমন- কারো সম্পদের ক্ষতি করা, সম্পদ চুরি করা, মারামারি করা প্রভৃতি। এ ধরনের আচরণগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সামাজিক ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন।

পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা

১. পরিবেশের দূষণ কমানো
২. স্বাস্থ্য ঝুঁকি কমানো
৩. জমির উর্বরতা রক্ষা করা
৪. পানির দূষণ কমানো
৫. প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার করা
৬. প্রাকৃতিক সম্পদের যথেষ্ট ব্যবহার রোধ করা
৭. পরিবেশবান্ধব উন্নয়ন চলমান রাখা
৮. পরিবেশ দূষণ ও অবনমন নিয়ন্ত্রণ করা
৯. লিঙ্গ সমতা ও সাম্যতা রক্ষা করা
১০. লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা নিরসন করা
১১. যৌন শোষণ ও অপব্যবহার এবং যৌন হয়রানি প্রতিরোধ করা ইত্যাদি।

ঈরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষায় প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য পালনীয়

- পরিবেশের ও সমাজের ক্ষতি হয় এমন কাজ করা থেকে বিরত থাকুন।
- মাটির স্বাস্থ্য রক্ষা ও পরিবেশ দূষণ কমাতে রাসায়নিক সার ব্যবহার কমিয়ে জৈব সারের ব্যবহার বৃদ্ধি করুন।
- নির্বিচারে রাসায়নিক বালাইনাশক ব্যবহার পরিহার করুন, প্রয়োজনে জৈব বালাইনাশক ব্যবহার করুন।
- চাষ কাজের সময় ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী যেমন: গ্লাভস, মাস্ক, টুপি, সেফটি জুতা, পোষাক ইত্যাদি ব্যবহার করুন।
- পারতপক্ষে প্লাস্টিক ও পলিথিন সামগ্রী ব্যবহার করবেন না।
- সেচের পানির অপচয় করবেন না।
- ফসলের অবশিষ্টাংশ যেমন খড় না পোড়াবেন না।
- খেতের জৈব আবর্জনা ও ফসলের অবশিষ্টাংশ পচিয়ে বা জৈব সার তৈরি করে খেতের মাটিতে মিশিয়ে দিন।
- খেতের আবর্জনা এখানে সেখানে না ফেলে নির্দিষ্ট স্থানে রেখে পরিবেশ দূষণ না করে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা করা।
- নিরাপদ/ ভালো পানি ব্যবহার করুন ও পানি দূষণ থেকে বিরত থাকুন।
- খেত/ খামারের কর্মীদের ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করা ও অসুস্থ হলে সেবা দিন। কর্মস্থলের কাছাকাছি কোনো স্থানে বা বাড়িতে ফাস্ট এইড বক্স রাখুন।
- খামারের কর্মী ও কৃষকের উপযুক্ত স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করুন।
- খামারের পুরুষ ও নারী কর্মীদের সুযোগ-সুবিধা প্রদান ও মজুরির ক্ষেত্রে কোনো বৈষম্য করবেন না।
- সকলের সাথে সম্মানের সাথে ভদ্রভাবে কথা বলুন।
- সকল ধরনের যৌন হয়রানি ও অশালীনতা থেকে দূরে থাকুন।
- স্থানীয় প্রাকৃতিক সম্পদ, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষা করুন।



চিত্র- ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী ব্যবহার



চিত্র- জৈব সার ব্যবহার



জেন্ডার ও সেক্সের পার্থক্য

জেন্ডার হল একটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ধারণা, যা নারী এবং পুরুষের মধ্যে প্রতিনিধিত্ব করে। জেন্ডার নির্ধারণ করে যে কোনও সামাজিক ভূমিকা, কর্মক্ষমতা, দায়িত্বে এবং সমাজের অন্যান্য দিক নির্ধারণ করে। এর মাধ্যমে মানুষের ভুল ধারণা এবং ধারণা বিষয়ে বোঝার প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ, একটি সামাজিক পদের ক্ষেত্রে জেন্ডার ধারণা নির্ধারণ করে যেমন, একজন পুরুষ সমাজের নেতৃত্বের দায়িত্ব নিতে পারে, যা নারীরা পারে না।

সেক্স বা লিঙ্গ হল নারী এবং পুরুষের শারীরিক বৈশিষ্ট্য এবং তাদের জীবনের একটি মৌলিক অংশ। এটি নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো থেকে নির্ধারিত হতে পারে: যেমন- জন্মের সাথে সাথে কে নারী ও কে পুরুষ হবে তা বোঝা যায়। উদাহরণস্বরূপ, একটি মানুষ যে পুরুষের লিঙ্গের সাথে জন্মে তাকে পুরুষ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

জেন্ডার সমতা ও জেন্ডার সাম্য

জেন্ডার সমতা (Gender Equality) বলতে এমন একটি অবস্থা বুঝায় যেখানে নারী ও পুরুষের মধ্যে সুযোগ-সুবিধা ও দায়-দায়িত্ব বন্টনে কোন বৈষম্য থাকবে না।

জেন্ডার সাম্য (Gender Equity) বলতে এমন একটি অবস্থা বুঝায়, যেখানে নারী ও পুরুষের মধ্যে সুযোগ-সুবিধা ও দায়-দায়িত্ব বন্টিত হবে শুধু সমতার ভিত্তিতে নয়, বরং ন্যায়সঙ্গত ও যৌক্তিকভাবে।



যৌন হয়রানি (GBV: Gender Based Violence):

যৌন হয়রানি হলো যেকোনো ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত যৌন আচরণ, যৌনতার সুযোগের অনুরোধ, অথবা যৌন আবেদনমূলক মৌখিক বা শারীরিক আচরণ, অথবা যৌন-প্রকৃতির অন্য কোনো প্রকারের আচরণ যা যুক্তিসঙ্গতভাবে অন্য কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধ, অপমান বা হয়রানিরূপে গণ্য হয়। যদিও সাধারণত একটি বিশেষ ধরনের আচরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যৌন হয়রানি সংঘটিত হয়, একটি মাত্র ঘটনাও যৌন হয়রানি হতে পারে। যৌন হয়রানি বিপরীত লিঙ্গের বা সমলিঙ্গের মানুষের প্রতি হতে পারে। কাজেই, নারী-পুরুষের যে-কেউ যৌন হয়রানির ভুক্তভোগী কিংবা অপরাধকারী হতে পারে।

বিভিন্ন ধরনের যৌন হয়রানি

শারীরিক যৌন হয়রানি, মৌখিক যৌন হয়রানি ও অমৌখিক যৌন হয়রানি।

- অপ্রত্যাশিত শারীরিক স্পর্শ, যেমন- হাত-চাপড়ানো, চিমটি, হাত বুলানো, চুমো, আলিঙ্গন, শরীর মছন, কিংবা অশালীন স্পর্শ। শারীরিক সহিংসতা বা যৌন-আক্রমণ;
- প্রশাসনিক, কর্তৃপক্ষীয় এবং পেশাগত ক্ষমতার অপব্যবহার করে অথবা ভয়ভীতি প্রদর্শন,

- যৌন আবেদনমূলক মন্তব্য বা ভাষা, কৌতুক, গল্প, অথবা অন্য কোনো মৌখিক ভঙ্গি যা যৌনতার ঈঙ্গিত বহন করে।
- যৌন হয়রানি বা আবেদনমূলক ব্যবহার বা আচরণ, দাবি, কিংবা যৌন সুযোগ লাভের জন্য অনুরোধ,
- বারবার অযাচিতভাবে সামাজিক নিমন্ত্রণ বা প্রেম নিবেদন করা এবং প্রেমে প্রত্যাখ্যাত হয়ে হুমকি দেয়া বা চাপ প্রয়োগ করা,
- ফোন, ই-মেইল বা অন্য কোনো মাধ্যমে যৌনতাপূর্ণ বার্তা পাঠানো।
- পর্নোগ্রাফি অথবা যৌনতা-নির্দেশক প্রদর্শন। অশালীন বা যৌন আবেদনময় ভঙ্গি, শিশু প্রদান,
- যৌনতাপূর্ণ কোনো ছবি, স্থির-চিত্র, বা ভিডিও নেয়া, ধারণ, প্রদর্শন বা প্রচার করা: কাউকে ব্ল্যাকমেইলিং বা কারও চরিত্র হননের উদ্দেশ্যে হোক বা অন্য কারণে হোক, যৌন-ঈঙ্গিত বা আবেদন রয়েছে এমন কোনো বস্তু, ছবি, চিঠি, ই-মেইল, স্কুদে বার্তা বা টেক্সট, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বা অন্য কোনো অনলাইন মাধ্যমের ব্যবহার;
- সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বিশেষ করে- ফেসবুক, ইমো, হোয়াটসঅ্যাপ- অপ্রয়োজনীয় ও আপত্তিকর টেস্ট, ইমোজি, হাসি বা অন্যান্য রিয়েকশন দেখানো ও অনুমতি না নিয়ে ছবি পোস্ট করা বা ট্যাগ করা।

যৌন শোষণ ও অপব্যবহার (SEA)

যৌন শোষণ ও অপব্যবহার (SEA) হল এমন একটি অবস্থা যেখানে কোনও ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির বিরুদ্ধে যে ধরনের অপব্যবহার, অসুবিধা বা অনৈচ্ছিক যৌন সংবাদ বা পরিস্থিতি সৃষ্টি করে যা তার অসুবিধাজনক অবস্থানের সৃষ্টি করে এবং তা বা সাহায্য বা অনুমতি ছাড়া হতে ধরা যাক এমন একটি খামার রয়েছে যেখানে শস্য রোপণ এবং ফসল কাটাতে সহায়তা করার জন্য বেশ কয়েকজন শ্রমিক নিয়োগ করা হয়। একদিন, একজন শ্রমিক তাদের সুপারভাইজারের কাছ থেকে অনুপযুক্ত এবং অবাঞ্ছিত আচরণের সম্মুখীন হয়; পরবর্তীতে সেই সুপারভাইজারের আচরণে কর্মী অস্বস্তি এবং হুমকি বোধ করেন।

সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট (SH)

সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট (SH) হল এমন একটি অবস্থা যেখানে কোনও ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির বিরুদ্ধে যে ধরনের অনৈচ্ছিক বা অনুচিত সেক্সুয়াল আকর্ষণ, মন্তব্য, বা পরিস্থিতি সৃষ্টি করে, যা অপমানজনক এবং অস্বীকার্য হতে পারে। এটি সমাজের নির্দেশ সামগ্রিকভাবে অস্বীকৃত এবং সামাজিকভাবে ক্ষতিকারক হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, কোনও কর্মস্থলে একজন কর্মকর্তা অথবা কর্মচারী অন্য কোনও সহকর্মীর বিরুদ্ধে অপমানজনক মন্তব্য বা অসদুপযোগী স্পর্শ করলে তা একটি সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্টের উদাহরণ হতে পারে।



যা জানা দরকার

শিশু নির্যাতন সংক্রান্ত যেকোন অভিযোগ জানানোর জন্য ডায়াল করুন ১০৯৮। নারী নির্যাতন সংক্রান্ত যে কোন তথ্য জানাতে ডায়াল করুন ১০৯২১, সাইবার অপরাধের ভোক্তাভূগী হলে ডায়াল করুন ০১৭৬৬৬।

Together, Let us Stop GBV, SEA, and SH! আসুন, একসাথে, GBV, SEA এবং SH বন্ধ করি!

ভূদ্যার পার্টনার ফিল্ড স্কুল পরিচালনার আধারন নির্দেশনা

১. প্রতিটি পিএফএস পরিচালিত হবে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মৌসুমব্যাপী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের (ইউএও/এএও/এইও/এসএপিপিও/এসএএও) দ্বারা। প্রতিটি পিএফএস-এর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ২ জন কর্মকর্তা দ্বারা পরিচালিত হবে। সংশ্লিষ্ট ব্লকের এসএএও সংগঠক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।
২. উপজেলায় উপজেলা কৃষি অফিসার তাঁর উপজেলার বরাদ্দকৃত পিএফএস-এর সংখ্যা ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা অনুযায়ী পিএফএস পরিচালনার প্রতিটি মৌসুমের শুরুতেই একটি পরিকল্পনাসূচি তৈরি করে তাঁদের দায়িত্ব প্রদান করবেন ও পিএফএস-এর গুণগত মান নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন।
৩. পিএফএস-এর ধরন অনুযায়ী টীম গঠন করা যেতে পারে। জিএপি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে জিএপি-পিএফএস পরিচালনার দায়িত্ব দিতে হবে।
৪. একটি পিএফএস-এ মোট ১০ টি সেশন পরিচালিত হবে। প্রত্যেক দিনের সেশন শুরুর আগে একটি দিবসের কর্মসূচি বড় কাগজে লিখে নিতে হবে ও প্রশিক্ষণস্থলে টাঙাতে হবে।
৫. দক্ষতার সাথে পিএফএস বাস্তবায়নের জন্য পার্টনারের পিএফএস নীতিমালা ও পিএফএস প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল অবশ্যই সঠিকভাবে অনুসরণ করতে হবে, প্রয়োজনীয় উপকরণের ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।
৬. পিএফএস-এর প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী সঠিক সময়ে এন্ট্রি দিতে/সংরক্ষণ করতে হবে।
৭. প্রশিক্ষণ শেষে সকলকে সনদপত্র ও সেরা অংশগ্রহণকারী ২ জনকে পুরস্কার প্রদান করা যেতে পারে।